ইন্দ্রজালের মায়া

হেমেন্দ্রকুমার রায়

ইন্দ্রজালের মায়া

হেমেন্দ্রকুমার রায়

ইবই নির্মাণ ও সম্পাদনা: শিশির শুভ্র

Find More Books

www.rachanabali.com

রাত্রির অভিজ্ঞতা

হঠাৎ মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুমটা কেন ভাঙল জানি না।

খোলা জানিলা দিয়ে বাইরের আবছা আলো ঘরটাতে সামান্য একটু আলো-আঁধারির মায়া ছড়িয়েছিল। কিন্তু তাতে স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছিল না।

দেখলাম একটা অশরীরী ছায়া আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি চমকে উঠে বললাম—কে?

কোনও শব্দ নেই।

টার্চটা জ্বালতে গেলাম। কিন্তু সেটা খুঁজে পেলাম না।

কোথায় গেল টর্চ?

আমি তো আমার বালিশের পাশেই ওটা রেখেছিলাম।

আমার পাশেই শুয়েছিল আমার ছোটোভাই ভাস্কর। তাকে ডাকতে চাইলাম। হাত বাড়ালাম সে আমার পাশে আছে কি না তা দেখার জন্য।

কিন্তু আমার হাত যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। গলার স্বরও গেল বন্ধ হয়ে।

কাউকে ডাকবার শক্তি আমার নেই। আমি অসহায়।

এমন সময় ঘটল। ভয়ংকর ব্যাপার।

অশরীরী ছায়াটা যেন তার আঁধার-মোড়া হাতটা দিয়ে আমার গলাটা চেপে ধরল। আমি চিৎকার করে উঠতে চেষ্টা করলাম। গলা দিয়ে স্বর বের হয় না।

কী করব বুঝতে পারছিলাম না।

তবে বুঝতে পারছিলাম। আমার মরণ নিশ্চিত।

কিছুক্ষণ আত্মবিহ্বলের মতো ছিলাম। হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে এল। কোথা থেকে আমার গায়ে শক্তি এল জানি না। সেই আসুরিক শক্তির বলেই যেন আমি বিছানার উপর উঠে বসলাম। তখনও অশরীরী ছায়ার হাত দুটো আমার গলা চেপে ধরে আছে।

আমি সেই হাত ছাড়াবার জন্য আমার গলায় হাত দিলাম। আমার হাতে কারুর হাত লাগল না। কিন্তু বুঝতে পারলাম। সেই অশরীরী হাত আমার গলা ছেড়ে দিয়ে আমার কাঁধে ভর করেছে। আমাকে যেন ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চাইছে বিছানার উপর।

আমি প্রবল শক্তি প্রয়োগ করে উঠে দাঁড়ালাম। এবার আমরা দুজনে মুখোমুখি। আমি ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চেষ্টা করলাম সেই অশরীরী শয়তানকে। কিন্তু তার আগেই সে আমাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে ফেলে দিল।

তারপর কী হল আমি জানি না।

পরদিন ভোরবেলা জ্ঞান ফিরতেই দেখি আমি বিছানায় শুয়ে আছি আমাকে ঘিরে আছে আমার মেসের বন্ধুরা।

ভাস্করই মেসের বন্ধুদের ডেকে এনেছে। সে-ও রাত্রিবেলায় সেই অশরীরীকে দেখেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। তার জ্ঞান ফিরেছিল। শেষ রাত্রে। আমাকে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সে ছুটে গিয়েছিল আমার মেসে, আমার বন্ধুদের ডেকে এনেছিল।

পরিমল এই গল্প বলেছিল বৈজ্ঞানিক এবং ডিটেকটিভ সুমন্ত তরফদারের কাছে। খুব কৌতূহল নিয়েই তরফদার সেই গল্প শুনছিলেন।

পরিমল বলল, ভেবেছিলাম দেশ থেকে মা বোনকে এনে কলকাতায় রাখব। তাই ওই বাড়িটার খোঁজে গিয়েছিলাম।

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, তাই বলে ওই বাড়িতে রাত কাটাতে গিয়েছিলেন কেন? বাড়িটা কি ভাড়া নিয়েছিলে?

পরিমল বলল, হ্যাঁ, ভাড়া নিয়েছিলাম বই কি। আমি মেসেই বহুদিন ধরে আছি। একটা ছোটোখাটো চাকরিও করছি। হঠাৎ ছোটোভাই ভাস্কর দেশ থেকে এসে হাজির। বলল, দেশে মা আর আমার বোন থাকতে চাইছে না, তাদের অবিলম্বে কলকাতা নিয়ে আসা প্রয়োজন।

—কেন?

দেশে নাকি জমিদারের নায়েব খুব জোরজুলুম করছে। বাবা থাকতেই বাড়ির জমির সীমানা নিয়ে জমিদারের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা ও ঝগড়া-বিবাদ চলছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর তাই আমার বিধবা মায়ের উপর চলছে জোর-জুলুম। ছোটোভাই ওখানেই থেকে দূরের গায়ের স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করে। তারও নানারকম অসুবিধা হচ্ছিল। তাই এসেছিল আমাকে খবরটা জানাতে। আমি ভেবেছিলাম, গায়ের বাড়িটা বিক্রি করে দেব। তাই খুঁজে খুঁজে এই বাড়িটা ঠিক করেছিলাম। কিন্তু—

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন—ওটা কি ভূত না কোন ছদ্মবেশী মানুষ?

পরিমল অবাক হয়ে বলল—ছিদ্মবেশী মানুষ? তা হবে কেন? ছদ্মবেশী মানুষ কেন আসবে। আমাকে ভয় দেখাতে?

তরফদার বললেন—কলকাতার বাড়ির অনেকরকম রহস্য আছে। কেউ হয়তো ওই বাড়িটা ভাড়া নেবে ঠিক করেছিল, বাড়িওয়ালা তাকে না দিয়ে আপনাকে দিয়েছেন, তাই আক্রোশে ভয় দেখিয়ে আপনাকে হটাতে

চাইছে। অথবা এমনও হয়তো হতে পারে, কেউ মওকায় ওই বাড়িটি নেবার চেষ্টায় আছে।

পরিমল বলল—না, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ওটা অভিশপ্ত বাড়ি, ভূতুড়ে বাড়ি, বিনে পয়সাও দিলে আমি নেব না।

তরফদার বললেন—আপনি কি সে-বিষয়ে স্যাংগুইন? ভূত এর আগে কখনও দেখেছেন আপনি?

—না।

—তা হলে?

—এরকম ভূতুড়ে কাণ্ডের কথা আমি অনেক শুনেছি। এবার যে নিজের জীবনেই এরকম ঘটনা ঘটল।

তরফদার বললেন—আমি কিছুদিন ধরে ভাবছি, ভূত নিয়ে গবেষণা করব। এবার সত্যি সেই কাজে নেমে পড়ব ভাবছি।

ঘটনাটা অনেকদিন আগের।

কিন্তু সেই ঘটনাচক্রের সঙ্গে যে নিজেকেই একদিন জড়িয়ে পড়তে হবে তা সুমন্ত তরফদার কখনও ভাবেননি।

ভূত-সংক্রান্ত কোনও ঘটনার কথা কানে এলেই তিনি তা শুনতে আগ্রহী হতেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবরাও ঠিক জুটিয়ে নিয়ে আসতে এমন সব লোকদের যাদের কাছ থেকে অনেক চমকপ্রদ কাহিনি তিনি শুনতে পেতেন। কোনওটি বিশ্বাস্য, কোনওটি বা অবিশ্বাস্য।

সুমন্ত তরফদারের নাম ধীরে ধীরে কলকাতায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

কত ঘটনা ঘটতে লাগল তাঁর জীবনে, সব ঘটনার রেক্ডে হয়তো তাঁর পক্ষে রাখা সম্ভব হত না।

এরপর যে ঘটনার কথা বলছি তার সঙ্গে আপাতত তরফদারের কোনও যোগাযোগ না থাকলেও পরবর্তীকালে সেই ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। এবার শুরু করছি পরবর্তী অধ্যায়।

বটব্যালের কাহিনি

কী হে বটব্যাল, কী খবর?

কোনও সাড়া নেই।

যে-লোকটি সুইংডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকল, সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গায়ে বুশ সার্ট, চোখে চশমা। হাতে ফলিও ব্যাগ।

সুনীল বটব্যাল তার টেবিলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে। সেই দৃষ্টি অফিসের কোনও কাগজপত্রের উপরও নয় বা কোনও ডিটেকটিভ বইয়ের উপরও নয়। দৃষ্টি নিবদ্ধ স্রেফ টেবিলের উপর। এবং যে স্থানটি নিতান্তই ফাঁকা।

কী হে বটব্যাল, তুমি দেখছি খুবই চিন্তিত।

তবু প্রতিপক্ষ থেকে কোনও প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না। আগন্তুক মিহির মিত্র খুবই বিস্মিত হল। বটব্যালের এমনভাবে চিন্তায় নিমগ্ন থাকার কী কারণ থাকতে পারে? তবু তার চিন্তাসূত্রে বাধা না দিয়ে বটব্যালের মুখোমুখি একটি চেয়ারে মিহির চুপচাপ বসে পড়ল।

এবার হুঁশ হল বটব্যালের। মুখ তুলে বলল, ওঃ মিহির, তুমি? হঠাৎ কী মনে করে?

হঠাৎ নয় হে, হঠাৎ নয়।—মিহির জবাব দিল। তারপর নিজের রিস্টওয়্যাচের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এসেছি। প্রায় দু-মিনিট ঊনত্রিশ সেকেন্ড। এক ঘণ্টা আগে একবার ফোন করেছি।—কালও দুপুরে ফোন করেছি একবার। বাট নো রেসপন্স কী ব্যাপার বলো তো?

বটব্যাল বলল, এক ঘণ্টা আগে ফোন করেছিলে? কাল দুপুরেও ফোন করেছিলে? কই, আমি তো কিছু জানি না। কেউ তো আমাকে ডেকে দেয়নি। কয়েকদিন হল আমার টেবিলের ফোনটা খারাপ হয়ে আছে। আচ্ছা তারপর খবর কী? এত হন্যে হয়ে আমাকে খোঁজবার অর্থ তো কিছু বুঝতে পারছি না।

ধীরে বন্ধু, ধীরে। আগে এক কাপ চায়ের অর্ডার দাও তো। সঙ্গে একটা টেস্ট বা মামলেট। এতক্ষণ আমাকে ডিটেন করার কমপেনসেশন।

বটব্যাল কলিংবেল টিপল। কেউ এল না। কিছুক্ষণ পর আবার টিপল। এবারও কেউ এল না। বিরক্ত হয়ে বটব্যাল বলল, আজকাল বেয়ারাগুলো হয়েছে সত্যি বেয়াড়া। কোনও কাজ ওদের দিয়ে করানো যায় না।

মিহির বলল, হুকুম দিয়ে কাজ করাবার দিন চলে গেছে বন্ধু। এখন অনুরোধ করে কাজ করাতে হবে।

বটব্যাল বলল, শুধু কি অনুরোধ? রীতিমতো তোষামোদ।

এমন সময় বেয়ারা এসে হাজির হল। বটব্যাল জিজ্ঞেস করল, কী হে অনন্ত, ঘুমোচ্ছিলে নাকি?' বেয়ারা কোনও জবাব দিল না।

বটব্যাল বলল, দু-কাপ চা আর দুটো মামলেট-এর ব্যবস্থা করে দাও তো অনন্ত।

আচ্ছা বাবু।—বলে অনন্ত চলে গেল।

কী ব্যাপার এবার বলে তো মিহির ?

বটব্যাল উদগ্রীব হয়ে মিহিরের দিকে তাকাল।

মিহির বলল, আমাদের এক আত্মীয় সপরিবারে এসে গেছেন কলকাতায়। তাদের জন্যে একটা বাড়ি খুঁজে খুঁজে হন্যে হয়ে পড়েছি। সব বন্ধুদের কাছেই ধরনা দিয়েছি। এজন্য। তোমার কাছে শুধু বাকি। তাই এলাম। বাড়ির কোনও হদিস তুমি দিতে পারে?

বটব্যাল হঠাৎ যেন চমকে উঠল।

মিহির জিজ্ঞেস করল, চমকে উঠলে যে!

বটব্যাল বলল, বাড়ির কথা শুনে।

মিহির বলল, বাড়ির কথা শুনে চমকাবার কী হল?

মানে তোমাদের তো নিজেদের বাড়ি রয়েছে।

বাড়িটা খুব পুরোনো, তা তো জানো। সেই বাড়ি রিপেয়ার হচ্ছে, কিছু কিছু অংশ ভাঙাও হচ্ছে। তাই একটা বাড়ি পেয়ে পরশুদিন চলে গেছি।

তাহলে তো বাড়ির সমস্যা মিটে গিয়েছে তোমার।

মিটে গেলে তো বাঁচতাম। কিন্তু সমস্যা আরো ঘোরালো হয়েছে।

মানে?

মানে আজকের মধ্যেই হয়তো বাড়িটা ছাড়তে হবে।

ছাড়তে হবে কেন? তা আবার আজকের মধ্যেই?

এমন সময় অনন্ত দুইেকাপ চা আর দুটো মামলেট নিয়ে এল। দুজনের সামনে চা আর মামলেটের প্লেট রেখে বটব্যালকে বলল, আপনার সঙ্গে একটা লোক দেখা করতে চায় বাবু।

বটব্যাল জিজ্ঞেস করল, দেখা করতে চায়? কে লোকটা ?

অনন্ত বলল, নাম বলছে ভজহরি। সাধারণ লোক। আধ ময়লা কাপড়-জামা পরনে ।

রোগা বেঁটেখাটো লোক তো?

আজ্ঞে হাঁ।

বটব্যাল বলল, কী মুশকিল!..একটু অপেক্ষা করতে বলো।

অনন্ত চলে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে বটব্যাল বলল, আঃ, লোকটা অসময়ে জ্বালাতে এল।

মিহির জিজ্ঞেস করল, লোকটা কে?

বটব্যাল বলল, বাড়ির দালাল। ও-ই তো বাড়িটার সন্ধান দিয়েছিল। কথা ছিল বাড়ির এক মাসের ভাড়ার টাকা ওকে দিতে হবে। ওটা ওর দালালি। কিন্তু দু-দিনের বেশি বাড়িতে থাকতে পারলাম না, টাকা কেন দেব বলতে পারো ?

মিহির জিজ্ঞেস করল, থাকতে পারলে না কেন?

বটব্যাল বলল, ভূতের উপদ্রবে।

ভূতের উপদ্রব? একী বলছ তুমি?—অনেকটা অবাক হয়েই মিহির বলল, ভূত আছে বলে তুমি বিশ্বাস করো? তা ছাড়া কলকাতার বাড়িতে ভূতের উপদ্রব-এ তো আরও আজগুবি কথা। পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে ওই রকম ঘটনা মাঝে মাঝে শোনা যায় বটে। অবশ্য-আমি তা মোটেই বিশ্বাস করি না। কিন্তু কলকাতার বাড়িতে—

মিহির একটু থামল। বটব্যাল বলল, বিশ্বাস তো আমিও করতাম না। কিন্তু দু-দিন ধরে ওই বাড়িতে যা ঘটছে তাতে অবিশ্বাস না করার কোনও কারণ নেই।

এমন কী ঘটছে বলো তো?

সে ভাই ভয়ানক, শুনলেও বুক কাঁপে।

তুমি নিজে দেখেছ না বাড়ির লোকেদের মুখে শুনেছ?

আমার নিজে দেখবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়নি। বাড়ির প্রত্যক্ষদর্শীর মুখেই শুনেছি।

কী শুনেছ বলো তো। শুনে মনের কৌতূহল চরিতার্থ করি।

এমন সময় অনন্ত এসে বটব্যালকে বলল, ওই লোকটা আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে বাড়িতে নাকি ওর বউয়ের খুব অসুখ, এখুনি ডাক্তার আনতে হবে, ওষুধ কিনতে হবে। ওর টাকার খুব দরকার।

বটব্যাল রাগত কণ্ঠে বলল, বলে দাও, আমার সঙ্গে এখন দেখা হবে না। ওকে কাল আসতে বলো।

মিহির বলল, আহা বেচারির টাকার দরকার বলেই এমন তাগিদ দিচ্ছে।

বটব্যাল বলল, ওদের টাকার দরকার সব সময়েই। বাড়িতে বউয়ের অসুখ না ছাই। টাকা আদায় করার একটা ছুতো মাত্র।

বটব্যাল জবাব দিল, কুড়ি টাকা; ত্রিশ টাকা দিয়েছি আর কুড়ি টাকা বাকি রয়েছে।

বাড়ি ভাড়া ক'ত?

পঞ্চাশ টাকা ।

চেয়ারের উপর বসেই যেন লাফিয়ে উঠল মিহির-বিলো কী? মোটে পঞ্চাশ টাকা বাড়ি ভাড়া? ঘর ক-খানা?

দু-খানা শোবার ঘর, একখানা রান্নাঘর। আর একখানা ঘরও ইচ্ছা করলে ব্যবহার করা যায়।

ইচ্ছা করলে মানে?

ওটা দোতলার ঘর, খালিই থাকে, তালা বন্ধ! এক বুড়ি বাড়ির দেখাশোনা করে। দরকার হলে তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে খুলে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মিহির পকেট থেকে টাকা বের করল। তিনখানা দশ টাকার নোট বটব্যালকে দিয়ে বলল, এই নাও তোমার দেওয়া ত্রিশ টাকা আর দালালের কুড়ি টাকা।

বটব্যাল অনেকটা ভ্যাবাচ্যাকার মতো জিজ্ঞেস করল, এর মানে তো কিছু বুঝলাম না?

মিহির বলল, এর মানে ওই বাড়িটা নিলাম। তুমি যেদিন থেকে ছাড়বে, সেদিন থেকে ওই বাড়িটা আমার।

ওই ভূতের বাড়িটা?

হ্যাঁ, ওই ভূতের বাড়িটাই নেব। ভূত-টুত আমি বিশ্বাস করি না। তা ছাড়া বাড়ির আমার ভয়ানক প্রয়োজন। বাড়ির খোঁজেই আজ তোমার এখানে এসেছিলাম।

তাই বলে ওই বাড়ি?

কী করব? আমার লক মাসিমা সপরিবারে হঠাৎ আমার বাড়িতে এসে উঠেছেন। অর্থাৎ আমার ঘাড়ের উপর এসে পড়েছেন বলতে পারো। তাই ঘাড় থেকে বোঝা নামবার জন্যেই খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি দরকার।

কিন্তু ওই ভূতের বাড়িটায় তোমার মাসিমারা থাকতে পারবেন কি না তা চিন্তা করেছ কি ?

উঠুক তো আগে ওই বাড়িতে। তারপর ভূতের সঙ্গেই না হয় লড়াই করা যাবে।

ভূতের বাড়ির কথা শুনলে তোমার মাসিমাই বা ওই বাড়িতে যেতে চাইবেন কেন?

হা হা করে হেসে উঠল মিহির। বলল, আমি কি এতই বোকা? ভূতের বাড়ির কথা তাদের বলবই বা কেন? দেখি না কী হয়, তারপর যা ব্যবস্থা করতে হয় করব।

বটব্যাল বলল, তুমি সত্যি বাড়িটা নেবে? তাহলে তো এখনই তোমাকে ভজহরির সঙ্গে গিয়ে বাড়িটা দেখে আসতে হয়। তবে সাবধান, আমি বাড়িটা ছেড়ে দিচ্ছি এবং তুমি নিচ্ছ একথা ভজহরিকে বোলো না। তাহলে তোমার কাছেও দালালির টাকা চাইবে।

মিহির বলল, সে আর বলার দরকার কী? কিন্তু তোমাদের মালপত্র যখন সরাবে তখন তো সে বুঝতে পারবে।

বটব্যাল বলল, সে তো আর ওখানে থাকে না যে মালপত্র সরাবার সময় দেখতে পাবে। তা ছাড়া মালপত্র এখনও তেমন কিছু নেইনি। দু-তিন দিন পরে মালপত্র নেব বলে স্থির করেছিলাম।

তাহলে ভালই হল। ডাকো তোমার ভজহরিকে। সামনা সামনি যা বলার বলে দাও। আমাকে ওই বাড়িটা দেখিয়ে দিক।

বটব্যাল অনন্তকে বলল, ওই লোকটাকে ভিতরে নিয়ে এসো তো।

আচ্ছা বাবু, নিয়ে আসছি, বলে অনন্ত চলে গেল।

বটব্যাল বলল, তুমি তো আমার বাড়ির সবাইকে চেনো। ভিতরে ঢুকে কথাবার্তা বলো । ভজহরিকে আর আটকে রেখো না। ওকে ছেড়ে দিয়ো।

এমন সময় ভজহরিকে নিয়ে অনন্ত এসে উপস্থিত হল।

বটব্যাল বলল, ওহে ভজহরি, এই নাও তোমার বাকি কুড়ি টাকা। তুমি খুশি হলে তো?

ভজহরি আনন্দে গদগদ হয়ে বলল, আমার ভারী উপকার করলেন বাবু। বউয়ের খুব অসুখ, একেবারে মরমর অবস্থা। এক্ষুনি ডাক্তার আনতে হবে, ওষুধ কিনতে হবে, পথ্যের জোগাড় করতে হবে—

সে আরও কী বলতে চাইছিল। বটব্যাল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, এখন তোমার বক্তৃতা রাখো। আমার এই বন্ধুটিকে সেই বাড়িতে নিয়ে যাও তো। আমি এখন যেতে পারছি না।

ভজহরি মিহিরের দিকে তাকিয়ে বলল, ওঃ, উনি বুঝি বাড়িটা চেনেন না? তা ঠিকানা দিয়ে দিন না। ৪০ বাই ২-এর বাসে উঠে ঘুটেপাড়ার মোড়ে নেমে সেখান থেকে ৮০ বাই ৩-এর বাসে খালপুলের মুখে নেমে—

বটব্যাল বলল, আঃ, আবার তোমার বক্তৃতা শুরু হল? যাতায়াত ভাড়ার জন্য চিন্তা কোরো না, আমার বন্ধু দেবেন।

মিহির বলল, তা ছাড়া এই নাও এক টাকা বিকশিশ।

ভজহরি এবার পারে তো মিহিরবাবুকে মাথায় তুলে নিয়ে যায়। তাই বলল, চলুন বাবু, আমি তো পা বাড়িয়েই আছি।

মিহির বলল, আচ্ছা চলো।

বটব্যালের দিকে তাকিয়ে বলল, এখন আসি হে সুনীল, পরে আবার দেখা হবে।

ভজহরিকে নিয়ে মিহির ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুনীল বটব্যাল বসে বসে ভাবতে লাগল কাজটা ভালো হল কি?

অন্তরঙ্গ এক বন্ধুকে বিপদের মুখে ফেলা হল। কিন্তু এ ছাড়া আর কি-ই বা করা যেত। মিহির তো জেনেশুনেই বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিল।

দেখা যাক, এই ভূতুড়ে নাটকের পরবর্তী দৃশ্য কী!

ধূর্ত ভজহরি

ভজহরি বড়ো ধড়িবাজ লোক। জলের মতো সহজভাবে পথের নিশানা বলে গেল, কিন্তু যেতে গিয়ে দেখা গেল বড়ো ঘোরালো পথ।

দ্বিতীয়বার বাস থেকে নেমেই মিহির জিজ্ঞেস করেছিল, কী হে, কতদূর হাঁটতে হবে?

ভজহরি জবাব দিয়েছিল, এই তো এসে গেছি বাবু! তারপর শুরু হল হাঁটা। পথ আর ফুরায় না।

ভজহরি জবাব দিল, এই, আর কয়েক পা এগুলোই—বাবু—

কয়েক পা-র বদলে কয়েক-শ পা হাঁটা হয়ে গেল। গলির পর এঁদো গলি তারপর কানাগলি। সেই কানাগলির শেষ প্রান্তে বাড়িটি ১৪।৪।১-বি মদনবিহারী কালাকার লেন।

বাড়ির কাছে এসে মিহিরের প্রাণান্ত। জলতেষ্টা পেয়ে গেল। ভজহরি কিন্তু খুব খুশি। গদগদ হয়ে, দেখুন বাবু, কী চমৎকার বাড়িই না। আপনার বন্ধুকে জোগাড় করে দিয়েছি। এত সস্তা ভাড়ায় এমন ভালো বাড়ি মাথাকুটেও কেউ পাবে না। আপনারও কি বাড়ির দরকার?

মিহির মনের ভাব গোপন করে বলল, না না, দরকার নেই।

বাড়িটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। গেটের দরজা বন্ধ। কয়েকবার কড়া নাড়ার পর থুরথুরে এক বুড়ি এসে দরজা খুলে দিল। ক্যাটকেটে গলায় বলল, বাব্বা, এই ভর দুপুরে কী জ্বালাতন! কাকে চাই?

মিহির বুড়িকে দেখে চমকে উঠল। কী বিশ্রী চামচিকের মতো চেহারা! মাংসের লেশমাত্র শরীরের কোথাও আছে কি না সন্দেহ। মিহির

বলল, এ বাড়িতে যে নতুন ভাড়াটে এসেছে তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বুড়ির এবার দৃষ্টি পড়ল ভজহরির দিকে। তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী রে আবার নতুন খদ্দের আনলি বুঝি?

ভজহরি বলল, না না, উনি ভাড়াটের বন্ধুলোক।

মিহির ভজহরিকে বলল, এবার তুমি যেতে পারো।

ভজহরি বলল, আমার কাজ তো এখনও শেষ হয়নি, বাবু। বাড়ির লোকের সঙ্গে মোলাকত করিয়ে দিই।

বুড়ি কী রকম অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর ভিতরে চলে গেল। ভজহরি মিহিরকে বলল, আপনি এদিকে আসুন।

দোতলা বাড়ি। ছোট্ট একফালি চাতাল পেরিয়ে ভজহরি মিহিরকে নিয়ে একতলার একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরটা বন্ধ। ভজহরি নিজেই এগিয়ে গিয়ে কড়া নাড়াল। কিছুক্ষণ পরেই এক মধ্যবয়সি ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিলেন। মিহির তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন মাসিমা?

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ মিহিরের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।

মিহির বলল, আমি সুনীলের বন্ধু মিহির।

ভদ্রমহিলার চোখে মুখে একটা হাসির আভাস ফুটে উঠল। বললে, ওঃ, তুমি মিহির? এতদিন পরে দেখে চিনতেই পারিনি। তারপর হঠাৎ কী মনে করে? এসো, ভেতরে এসো।

মিহিরের সঙ্গে ভজহরিও ঘরে ঢোকবার জন্য পা বাড়াল। ভদ্রমহিলা স্বভাবসুলভ ভদ্রতায় বললেন, আসুন, আপনিও আসুন।

মিহির কোনও আপত্তি করল না। তার সঙ্গে ভজহরিও ঘরে গিয়ে বসল। ঘরের আসবাবপত্র সব অগোছালো। একটি সোফা এক ধারে রেখে দেওয়া হয়েছে, তার পাশে একটি টুল। মিহির সোফায় বসল, ভজহরি বসল টুলে। মিহির বলল, আগে এক গ্লাস জল দিন তো মাসিমা। গলি ঘুরতে ঘুরতে একবারে হাঁপিয়ে গেছি।

হ্যাঁ দিচ্ছি বলে ভদ্রমহিলা ভিতরের দিকে চলে গেলেন। তার একটু পরেই এলেন হাতে এক গ্লাস জল নিয়ে। আবার ভিতরে চলে গেলেন। ভদ্রমহিলা হয়তো চা ও জলখাবারের ব্যবস্থার জন্যই তাদের একটু বসতে বলে গেলেন।

মিহির কিন্তু ভজহরির কার্যকলাপে বেশ একটু আশ্চর্য বোধ করল এবং ক্রমশ বিরক্তও হতে লাগল। ঘরে যার স্ত্রী মরণাপন্ন সে কীভাবে এতক্ষণ নিশ্চিন্তভাবে বাইরে থাকে। আর যাবার নামটিও করে না! সুনীল যে বলেছিল, বউয়ের অসুক-বিসুক কিছু না, ওটা টাকা নেওয়ার ফন্দি, সে কথাটাই ঠিক।

কিন্তু এমনভাবে পেছনে লেগে থাকার মানে কী হতে পারে? লোকটা কি ভিতরের কোনও খবর জেনে নিতে চায়? অথবা এই বাড়িটা মিহির নেবার জন্য আগ্রহী তা সে অনুমান করতে পেরেছে?

লোকটা যে ঘুঘু তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু মিহিরও সতর্ক, সহজে ধরা দেবে না। ভদ্রমহিলা কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে উপস্থিত

হলেন। তার সঙ্গে একটি স্ত্রীলোকসম্ভবত বাড়ির পরিচারিকা—তার হাতে দু-কাপ চা ও দু-প্লেট খাবার।

মিহির তা দেখে একটু বিস্মিত হল। এই ভূতুড়ে বাড়িতে কি সবই ভূতুড়ে, এত তাড়াতাড়ি চা আর খাবার এল কী করে?

ভজহরি যেন চা আর খাবারের আশাতেই বসেছিল। প্লেটের চারখানা গরম লুচি সঙ্গে সঙ্গেই উদারস্থ করল। তারপর এক চুমুকেই সবটুকু গরম চা নিঃশেষ। তলানি পর্যন্তও রাখল না। মিহিরের কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে লাগল।

ভদ্রমহিলা সুনীল বটব্যালের মা। ধরিত্রীদেবী। তিনি তক্তাপোশের উপর বসে মিহিরের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। বাড়ির কথা উঠতেই মিহির ভজহরিকে বলল, ভজহরি, তুমি এবার যেতে পারো। আমাদের এখন ঘরোয়া কথাবার্তা হবে। তা ছাড়া তোমার তো তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। বাড়িতে তোমার বউয়ের অসুখ। তুমি চলে যাও, আমার যেতে একটু দেরি হবে।

ভজহরির তবু উঠবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এমন করে বলার জন্যই বুঝি নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে পড়ল।

মিহির এবার ধরিত্রীদেবীকে বলল, নতুন বাড়িতে এলেন, চলুন, বাড়িটা একটু ঘুরে দেখি।

ভালোই লাগল। বলল, বাড়িটা তো মোটামুটি ভালোই, তবে গলিটাই যা বিদঘুটে। তবু কলকাতায় যা বাড়ির সমস্যা তাতে এত কম ভাড়ায় এমন বাড়ি পাওয়া খুবই মুশকিল।

একটা ঘর তালাবন্ধ। সে ঘরটা ধরিত্রীদেবী খুললেন না। মিহির জিজ্ঞেস করল, এ ঘরটা কি আপনাদের ভাড়ার মধ্যে নয়?

ধরিত্রীদেবী বললেন, এটার সঙ্গে ভাড়ার কোনও সম্পর্ক নেই। ইচ্ছা করলেই ব্যবহার করা যায়। প্রথম দিন খুলেছিলাম। তারপর সুনীল এটা ব্যবহার করতে বারণ করে গেছে। খুলতেও বারণ করেছে।

মিহির বলল, থাক, তাহলে আর খুলে দরকার নেই।

একপাশে একটা সরু সিঁড়ি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, ওটা কি দোতলায় উঠবার সিঁড়ি ?

ধরিত্রীদেবী বললেন, হ্যাঁ কিন্তু আমরা দোতলায় উঠি না। উঠে আর কী হবে ?

মিহির বলল, সুনীলের মুখে শুনলাম আপনারা নাকি এ বাড়িটা শিগগিরই ছেড়ে দেবেন ?

পেছন দিক দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ধরিত্রীদেবী মিহিরকে নিয়ে চাতালের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, হ্যাঁ, রাত হলেই কেমন যেন ভয় ভয় করে। বাড়ির ঝি মোক্ষাদা তো দু-দিন ধরে রোজই ভয়ে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। তাই আমরা বড়ো ভাবনায় পড়ে গেছি।

মিহির জিজ্ঞেস করল, কী দেখে সে চিৎকার করে আর কী জন্যই বা অজ্ঞান হয় তার খোঁজ নিয়েছেন কি?

ধরিত্রীদেবী বললেন, ও কিছু পরিষ্কারভাবে বলতে পারে না। শুধু বলে কী যেন ওর সামনে, কখনও পেছনে চলে বেড়ায়। কিন্তু চোখে কিছু দেখতে পায় না।

মিহির বলল, আমার মনে হয় মোক্ষদা বড্ড ভিতু।

ধরিত্রীদেবী বললেন, আমাদের বাড়িতে তো সে অনেকদিন কাজ করছে, কিন্তু ভিতু বলে তো কখনও মনে হয়নি। একদিন তো চোরের পেছনে ধাওয়া করে সে চোরের হাত থেকে জিনিস কেড়ে রেখেছিল। এ বাড়িতে এসেই যেন সে কেমন হয়ে গেছে। তাই তো আমরাও বড়ো ভাবনায় পড়েছি।

মিহির জিজ্ঞেস করল, আপনি কিছু দেখেছেন?

ধরিত্রীদেবী বললেন, না, এখনও কিছু দেখিনি। কিন্তু রাত হলেই শরীরটা কেমন ভার হয়ে যায়, বুকটা ধুকপুক করতে থাকে। মনে হয় কে যেন বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়তো কী একটা অশুভ জিনিস। এই বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে।

মিহির জিজ্ঞেস করল। 'সে জন্যই বুঝি সুনীল এ বাড়ি ছাড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে?'

ধরিত্রীদেবী বললেন, বাড়ি পেলে আজকেই আমরা চলে যাব।

এমন সময় হঠাৎ মিহিরের চোখে পড়ল, সেই বাড়িটারই অপর দিকের অংশের একটি ঘরের জানালা খোলা। আর সেই জানালায় দুটি কৌতুহলী মুখ। তারা উৎকর্ণ হয়ে যেন এইসব কথাবার্তা শুনছে। দুটো মুখই চেনা। একটি মুখ সেই বুড়ির আর একটি মুখ ভজহরির।

ভজহরি তাহলে যায়নি? বুড়ির ঘরে লুকিয়ে আছে? মিহিরের শরীরে যেন একটা বিদ্যুতের শক লাগল। নিশ্চয়ই ভজহরির মনে কোনও দুষ্ট বুদ্ধি আছে। মনে হয় সব ব্যাপার সে আড়ি পেতে দেখছে ও শুনছে।

হঠাৎ জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল। জানালা বন্ধের শব্দ শুনে ধরিত্রীদেবী সেদিকে তাকালেন। কিন্তু কোনও কিছু বুঝতে পারলেন না।

মিহির জিজ্ঞেস করল, ওই ঘরে কে থাকে?

ধরিত্রীদেবী বললেন, এক বৃদ্ধ মহিলা। অনেকদিন ধরেই এই বাড়িতে আছেন। ধরতে গেলে উনিই এখন বাড়ির মালিক। কারণ মালিক নাকি কলকাতায় নেই। ওই বৃদ্ধাই বাড়িভাড়া আদায় করেন।

মিহির বলল, ওই বাড়ির দালালটা কি রোজই এই বাড়িতে আসে? ওই যে, যে লোকটা আমার সঙ্গে বসে চা-জলখাবার খেয়ে গেল?

ধরিত্রীদেবী বললেন, অত কি আর আমি লক্ষ রাখি বাবা? তবে আমার চোখে তো পড়েনি।

মিহির বলল, ওই লোকটাকে সাবধান। খুব সুবিধার লোক বলে মনে হয় না। যা হোক এখন আমি আসি মাসিমা । পরে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে।

ধরিত্রীদেবী বললেন, আর একটু বসে যাও বাবা।

মিহির বলল, না মাসিমা । আমার মাথায় ভারী বোঝা চেপে আছে। সে বোঝা নামাতে পারলেই তবে শান্তি!

ধরিত্রীদেবী কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেন কী হয়েছ?

মিহির বলল, সেসব কথা এক সময় বলব আপনাকে। ... পরে সবই জানতে পারবেন।

মিহির চলে গেল। ধরিত্রীদেবী কী যেন আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর দেখলেন, ভজহরি চোরের মতো চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সুনীল বাড়িটা ছেড়ে দিল। নিজেদের ভাঙা বাড়িতেই আবার উঠে এল। মা ধরিত্রীদেবী কিছুতেই সেই ভূতুড়ে বাড়িতে থাকতে রাজি হলেন না।

বললেন, কষ্টে-শিষ্টে থাকি তবু নিজের বাড়িতেই কোনওরকমে কাটিয়ে দেব। তবু ওই রকম ভয় ভাবনা নিয়ে রাত কাটানো চলে না। রাত হলে যেন গায়ের রক্ত শুকিয়ে যায়।

বিজয়ের প্রসঙ্গ

সেই বাড়িতেই এসে উঠলেন মিহিরের মাসিমা মলিনাদেবী। মিহিরদের বাড়িতে উঠে যে কষ্টের মধ্যে কয়েকদিন ছিলেন, এই বাড়িতে এসে সেই কষ্ট ভুলে গেলেন। হাত-পা মেলে ছড়িয়ে থাকতে পারলেন।

তথাকথিত বাড়িওয়ালি বুড়ি কিন্তু ভয়ানক সেয়ানা। পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে যখন সে টের পেল যে নূতন কিছু লোক বাড়িতে আমদানি হয়েছে, তখন জানালায় আড়ি পেতে দেখতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে বুঝতে পারল বাড়ির সবগুলি লোকই নূতন। তখন তার খুব সন্দেহ হল।

বুড়ি হাঁটতে হাঁটতে এল মলিনাদেবীর ঘরে। এসে প্রথমে ভাব জমাবার চেষ্টা করল। বলল, তোমরা নতুন এলে বুঝি? বেশ বেশ! তাই তো বলি ঘরে নতুন লোকের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে কেন?' বুড়ি একটু থামল। তারপর ঘরের এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল, রাত্রিবেলায় চুপি চুপি এলে, একটু জানতেও পারলাম না। তোমরা না হয় অচেনা লোক। কিন্তু যারা ছিল তারাও তো একটু জানিয়ে যেতে পারত।

মলিনাদেবী বুঝতে পারলেন বাড়িওয়ালি বুড়ি তাঁর কাছ থেকে কথা বের করবার চেষ্টা করছে। তাই বলল, না, না, তারা তো যায়নি। আমরা তো তাদের বাড়িরই লোক। আমি তো সুনীলের মাসিমা।

বুড়ি কিন্তু বাঁকা পথে চলল। বলল, মাসিই হও আর পিসিই হও— তোমাদের রেখে ওরা চলে গেল চুপিচুপি, এটা কেমন ভদ্রতা? আমি কি

বাড়ির কিছুই নই? কাল আফিংটা একটু বেশি খেয়েছিলাম বলে ঝিমুনিটা একটু বেশি এসেছিল। তাই কিছু টের পাইনি।

মলিনাদেবী বললেন, ওরা তো যায়নি। ওই তো ওদের জিনিসপত্র ঘরে রয়েছে। আবার ওদের দেখতে পাবেন।

বুড়ি ঘরের জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে গজগজ করতে করতে চলে যাচ্ছিল। মালিনাদেবী বললেন, আহা চলে যাচ্ছেন কেন? বসুন।

আর বসব কী করতে? সব তো জেনেই নিলাম।

চা খান ।

চায়ের কথা শুনে বুড়ির চোখ মুখের চেহারা যেন পালটে গেল। পেছন ফিরে বলল, আবার চা কেন ?

আমাদের চা হচ্ছে। এসেছেন যখন— বলতে বলতেই চা এসে গেল। সঙ্গে মাখন-মাখানো পাউরুটি ও সন্দেশ। বুড়ি এমন লুব্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাল মনে হল এ ধরনের খাবার সে কোনওদিন চোখে দেখেনি।

খাবার খেতে খেতে বুড়ি খুব খুশি হয়ে উঠল। মন যেন তার উদার হয়ে গেল। বলল, ওরা কেন চলে গেল তা জানি।

মালিনাদেবী বিস্মিতভাবে বুড়ির দিকে তাকালেন। কী বলতে চায় বৃদ্ধা! আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞেস করলেন, কী জানেন। আপনি?

বুড়ি জবাব দিল, তা তোমাদের কাছে বলে আর কী হবে?

মলিনাদেবী বললেন, বলুন না।

বুড়ি বলল, তবে একটা কথা আমি বলতে পারি যারা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তারা আর আসে না।

মলিনাদেবী চমকে উঠলেন সে কথা শুনে। জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

বুড়ি তারিয়ে তারিয়ে পাউরুটি আর সন্দেশ সহযোগে চা খেতে লাগল। ফোকলা দাঁতে পাউরুটি চিবুতে চিবুতে বলল, আসবে কেন? আমি হলে আমিও আসতাম না। শুধু ভিটার মায়ায় পড়ে আছি। সে তোমরা বুঝবে না মা, পরে একদিন বলব।

খেতে খেতে থামল একটু। কিছুক্ষণ কোনও কথা বলল না। মলিনাদেবী উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে বুড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর নিজের খাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল।

বুড়ি কিন্তু অক্লেশে খেয়ে যেতে লাগল। বলল, তোমরাও হয়তো এমনি করে একদিন চলে যাবে।

বুড়ি চা ও খাবার নিঃশেষ করে চলে গেল। মলিনাদেবী বসে বসে ভাবতে লাগলেন, বৃদ্ধার কথাবার্তায় কী রকম যেন একটা রহস্য। মিহির কেমন বাড়িতে আমাদের নিয়ে এল?

যাক, বাড়িটা যে পাওয়া গেছে এটাই সবচেয়ে সৌভাগ্য। বাড়িওয়ালির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী? তার সঙ্গে বেশি কথাবার্তা না বললেই হল।

কিন্তু আবার ভাবতে লাগলেন, বৃদ্ধার মুখ থেকে বাকি কথাগুলো শুনে নেওয়া দরকার। নানারকম চিন্তাভাবনার মধ্যে সেদিনটা কেটে গেল।

মলিনাদেবীদের সংসারের লোকজন নেহাত কম নয়। স্বামী পীড়িত, তার জন্য একটি ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। সে ঘরে বিশেষ লোকজন যেতে দেওয়া হয় না। অন্যান্য ঘরে ছেলে এবং দুই মেয়ে নিয়ে তিনি থাকেন। দোতলার ঘরটির চাবি নিয়ে রাখা হয়েছে, এখনও সেই ঘরটি ব্যবহার করা হয়নি।

বড়োছেলে বিজয় মিহিরের প্রায় সমবয়সি। অমরনাথ পীড়িত থাকায় বিজয়ই সংসারের সব কিছু দেখাশোনা করে।

বিকেলবেলা বিজয় কিছু জিনিসপত্র কেনার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলায় এল মিহির। কাল রাতটা মাসিমার কীভাবে কেটেছে তা জানবার জন্য তার মনে একটা কৌতূহল রয়েছে। কিন্তু সোজাসুজি কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা হল না। তাই প্রথমে কিছু জিজ্ঞেস না করে সাধারণভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল।

মলিনাদেবী হেসে মিহিরকে আপ্যায়ন করলেন, এসো, এসো মিহির।

বিজয় কোথায় গেছে? ওকে দেখছি না তো?

দোকানে কী সব জিনিসপত্র কিনতে গেছে। সেই দুপুরে গেছে। অনেকক্ষণ আগেই তার ফেরার কথা; এখনও কেন যে এল না-বড়ো ভাবনা হচ্ছে।

ভাবনার কী আছে। কলকাতা শহর, হয়তো দোকানে বাজারে ঘুরছে।

মিহির তক্তাপোশে বসতে যাচ্ছিল। মলিনাদেবী বললেন, ওখানে বসছ কেন বাবা। সোফায় বোসো।

সুনীলদের সোফাটা তখনও সেই ঘরে ছিল। দু-দিন আগে এসে এখানেই সে বসেছিল। তাতেই আজও বসল। মলিনাদেবী জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের বাড়ির সবাই ভালো আছে তো?

হাঁ, ভালো আছে মাসিমা। আপনারা চলে আসার পর আমাদের বাড়ি যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। ভারী খারাপ লাগছিল। আজ ভোরবেলায় উঠে।

তা তো লাগবেই। আমাদেরও খারাপ লাগছিল।

এবার মিহির অন্য প্রসঙ্গে আসবার সাহস পেল। জিজ্ঞেস করল, এখানে আপনাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো?

মলিনাদেবী বললেন, না, কোনও অসুবিধা হবে কেন? বাড়িতে প্রচুর জায়গা। হাত-পা মেলে এখানে থাকতে পারছি।

এমন সময় বিজয় এসে উপস্থিত হল। অনেক কিছু জিনিসপত্র কিনে নিয়ে এসেছে। কিছু এনেছে নিজের হাতে আর কিছু এনেছে কুলির মাথায়। এসেই মিহিরকে দেখে হই। হই করে উঠল। বলল, তোদের বাড়িতে গেছলাম। তোকে না পেয়ে তোর মায়ের কাছে বলে এসেছি আমাদের এখানে অতি অবশ্য আসতে।

মিহির জিজ্ঞেস করল, কেন, কী এমন জরুরি ব্যাপার?

নিশ্চয় জরুরি। এখন নয়, পরে বলব।

মিহিরের বুক ধুকপুক করতে লাগল। নানা সন্দেহ তার মনে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। কথাটা শুনতেও ভরসা হচ্ছিল না, আবার না শুনেও কেমন অস্বস্তি লাগিছিল।

বিজয় কুলির মাথা থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে কুলিকে বিদায় করে দিল। হাত-পা ধুয়ে এসে বসল। মিহিরের পাশে।

চা খেতে খেতে অনেক গল্প গুজব হল। মিহিরের কিন্তু জরুরি কথাটি শোনবার জন্য ভয়ানক কৌতূহল। কিন্তু বিজয়ের বলবার কোনও আগ্রহ নেই।

মিহির ভাবলা, এবার না উঠলে বিজয় জরুরি কথাটি বলবে না। তাই বলল, এবার উঠি মাসিম, আসি বিজয়।

বিজয় বললে, সে কী রে, উঠিবি কেন?

বাঃ, বাড়ি যাব না?

না, আজকে যেতে হবে না, এখানেই থাকবি।

মানে ?

মানে আর কী? এখানেই আহার, এখানেই রাত্রিবাস।

তা হলেই তো সর্বনাশ!

বাঃ, কবিতার মতো বেশ মিল করে কথা বলছিস দেখছি।

তা হল বটে। ওদিকে আমার বাড়িতে যে খাবার নষ্ট হবে।

না, নষ্ট হবে না। আমি মাসিমাকে বলে এসেছি।

কিন্তু বাড়ি না ফিরলে যে সবাই চিন্তার করবে।

না, চিন্তা করবে না। সে কথাও বলে এসেছি।

যা হোক মিহিরকে থাকতেই হল।

সন্ধ্যা হতেই মিহির লক্ষ করল, বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট নেই। ঝি হ্যারিকেন জ্বলিয়ে দিয়ে গেল। হ্যারিকোনটাও সদ্য কেনা বলে মনে হয়।

দেখছি। লাইট নেই কেন?

বিজয় বলল, মান্ধাতা আমলের ইলেকট্রিক অয়্যারিং, কবে কোন যুগে এ বাড়িতে লাইট জ্বলত, তা হয়তো ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়।

মিহির বলল, কলকাতায় বাস করতে হলে লাইট অবশ্য দরকার। তোরা চেষ্টা করে এবার আনিয়ে নে ।

বিজয় বলল, তা অবশ্য চেষ্টা করব। কিন্তু আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে না। বাইরে তো আমরা ইলেকট্রিক লাইট ছাড়াই বাস করতাম।

বৈদ্যুতিক আলোতে বাস করা অভ্যাস, তাই মিহিরের খুব ভালো লাগছিল না। তবু বিজয়ের অনুরোধ ও উপরোধে তাকে থাকতেই হল। খাওয়া-দাওয়া করতে করতে বাজল রাত প্রায় দশটা ।

বাড়িতে দোতলার যে ঘরটা বন্ধ ছিল, সেই ঘরটার উপর মিহিরের আগ্রহ জেগে উঠল। বলল, "আয়, তোতে-আমাতে ওই ঘরটায় শুয়ে রাত কটাই।

বিজয় বলল, না, ও ঘরটা বড় অপরিষ্কার। রাত্রিবেলায় পরিষ্কার করাও সম্ভব হবে না।

মিহির বলল, যতটুকু পরিষ্কার করা যায় তাতেই চলবে। পরে না হয় ভালোভাবে পরিষ্কার করা যাবে।

তাই করা হল। দোতলার ঘরটা খুলতেই বেরিয়ে এল একটা ভ্যাপসা গন্ধ। জানালাটা খুলতেই ভাঙা ঘুলঘুলিটা দিয়ে কয়েকটা চামচিকে উড়ে পালাল। মোটামুটি ঝাড়ু দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ খুলে রাখা হল ঘরটাকে। নীচে থেকে তক্তাপোশও উপরে তোলা হল।

এবার শোবার পালা। শুতে শুতে হয়ে গেল রাত প্রায় বারোটা। পাড়াটা নিঝুম হয়ে গেছে। কানাগলিতে একেই বিশেষ কোনও লোকের যাতায়াত নেই, তার উপর এত রাত্রে জায়গাটাকে একটা পল্লিগ্রাম বলেই মনে হল।

এই অবস্থায় বাস করতে মিহির অভ্যস্ত নয়। কাজেই তার কাছে খুবই অস্বস্তি লাগল। তবু তার মনের কৌতূহল-বিজয়ের সেই জরুরি কথাটা শোনবার আগ্রহ তার মনকে ব্যাকুল করে তুলল।

অনেকক্ষণ কেটে যায়। তবু বিজয় কিছু বলে না। তখন মিহির নিজেই জিজ্ঞেস করল, কী রে, সেই জরুরি কথাটা বললি না?

বিজয় বলল, কোন জরুরি কথা?

ওই যে বলবি বলেছিলি।

হো হো করে হেসে উঠল বিজয়। বলল, সেই জরুরি কথা বলতে কি এখনও বাকি আছে ?

বিস্মিতভাবে মিহির জিজ্ঞেস করল, কখন বলবি?

তোকে যে এখানে খেতে হবে, থাকতে হবে এটা কি জরুরি ব্যাপার নয়?

বাতাস বেরিয়ে যাওয়া বেলুনের মতো চুপসে গিয়ে মিহির বলল, ওঃ, এই ব্যাপার?

কৌতূহল কাটল। কিন্তু অস্বস্তি গেল না। শোবার পর কত রকম ভাবনা তার মনে আসতে লাগল। সুনীলরা তিন রাত্রির বেশি এই বাড়িতে থাকতে পারলে না কেন? এদের তো আজ নিয়ে তিন রাত্রি কাটবে। এরা কি থাকতে পারবে এই বাড়িতে? যদি থাকতে পারে। তবে তো ভালোই। কিন্তু না থাকতে পারলেই আবার ঝামেলা দেখা দেবে।

হঠাৎ ঘরের পেছন দিকে কী যেন একটা শব্দ শোনা গেল। লোকের পায়ের শব্দ কি?

তাহলে কি এ বাড়ির কেউ এখনও জেগে আছে?

কিন্তু এত রাত্রে কারুর জেগে থাকার তো কথা নয়?

মিহির ধীরে ধীরে ডাকল, বিজয়-বিজয়া!

বিজয়ের কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে সে। মিহিরের সন্দেহ হল। এত তাড়াতাড়ি বিজয় ঘুমিয়ে পড়ল! কিন্তু নানা ভাবনায় যে অনেকক্ষণ কেটে গেছে তা হয়তো খেয়াল নেই। তাই আবার ডাকল, বিজয়-বিজয়!

এবারও সাড়া পাওয়া গেল না। বরং মৃদু নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল। সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

ওদিক থেকে কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল। আবার সেই পায়ের শব্দ। সুনীলের মায়ের কথা মিহিরের মনে জাগতে লাগল। ধরিত্রীদেবী বলেছিলেন, কী যেন কখনও সামনে কখনও পেছনে চলে বেড়ায়, কিন্তু চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। একি সেই আত্মা ?

কিন্তু বিজয়রা কেউ এর সন্ধান পায়নি কেন? বিজয় তো বেশ নির্বিবাদে ঘুমোচ্ছে। এ বাড়ির অন্যান্য সকলেই বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বেলায় এমন হল কেন? আবার সেই শব্দ। কয়েকবার শব্দ হওয়ার পর যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। এবার ঘুমোতে চেষ্টা করল মিহির। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসতে চায় না। নানারকম ভাবনা যেন তার মাথায় ঘুরতে লাগল।

বুড়ি তো এ বাড়িতে আছে অনেকদিন। তার কোনও ভয়-ভাবনা নেই কেন? বুড়ি কি এই ব্যাপারটা জানে? জানলেও সে ভয় পায় না কেন?

আবার সেই শব্দটা শোনা যায় কি না। সেজন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল মিহির। ...না, শব্দটা আর শোনা গেল না।

এরও বেশ কিছুক্ষণ পর মিহির ঘুমিয়ে পড়ল। খুব ভোরেই মিহিরের ঘুম ভেঙে গেল। এত দেরি করে ঘুমোবার পরও ঘুম ভাঙতে দেরি হল

না। অবশ্য মলিনাদেবী ও অন্যান্যরা অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠে গেছেন। কেবল বিজয়ই তখনও ঘুমোচ্ছে। মাঝে মাঝে একটু নাক ডাকারও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে চায়ের ডাক শুনেই কিন্তু বিজয় জেগে উঠল। মলিনাদেবী বললেন, ওর ঘুমটাই ওরকম। চ্যাঁচামেচি করলেও উঠবে না। কিন্তু চায়ের পেয়ালার টুং টাং আওয়াজ শুনেই জেগে উঠবে।

মিহির হেসে বলল, এ-ও এক ধরনের কুম্ভকর্ণ। ত্রেতাযুগের কুম্ভকর্ণের কিন্তু চায়ের পেয়ালার শব্দে ঘুম ভাঙত না।

মনে মনে ভাবল, ভূতের পায়ের শব্দেও হয়তো বিজয়ের ঘুম ভাঙবে না। যাক, তবু বাঁচোয়া।

কিন্তু শুধু বিজয়কেই যে সেই অশরীরী আত্মা আক্রমণ করবে তার নিশ্চয়তা কী? বাড়ির অন্যান্য লোকের ঘুম তো আর বিজয়ের মতো নয়। তবে?

চা খেয়েই বিদায় নিল মিহির। তাকে বাড়ি গিয়ে তৈরি হয়ে কাজে বেরুতে হবে। কিন্তু মন তার বিষণ্ন-চিন্তায় ভরাক্রান্ত। এই বাড়ির রহস্যটা কী?

মিহির বাড়ি ফিরে ভাবতে লাগল—ওই ভূতুড়ে বাড়িতে মসিমারা থাকতে পারবে কি? যদি না থাকতে পারে তবে আবার বাড়ি খুঁজতে হবে তাদের জন্য।

কিন্তু ওই ভূতুড়ে বাড়ির রহস্যটা কী? বর্তমান যুগে ভূতকে বিশ্বাস করাও অন্যায়। অথচ ভুতকে অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। বিশেষ করে কাল রাত্রের ঘটনায় মনে একটা সন্দেহও জেগেছে।

সারাদিন একটা অস্বস্তির ভিতর দিয়ে মিহির দিন কাটাল। সন্ধ্যা হতে না হতেই ভাবল, আজ ওই বাড়িতে গিয়ে রাত কটাব কি? তা হলে রহস্যের একটা কিনারাও হয়তো হতে পারে।

যাই যাই করেও যাওয়া হল না। নানা চিন্তার মধ্য দিয়ে রাতটাও কেটে গেল।

পায়ের শব্দ?

পরদিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে যথারীতি হাত-মুখ ধুয়ে মিহির চা খেতে বসেছে এমন সময় হঠাৎ বিজয় এসে উপস্থিত। তাকে দেখে মিহির চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, আরে বিজয় যে! এই সক্কালবেলা কী ব্যাপার?

বিজয়ের মুখ গম্ভীর, দেখে মনে হল কোনও চিন্তায় তার মন ভরাক্রান্ত। তা দেখে মিহিরও চিন্তিত হয়ে পড়ল। জবাবের আশায় তাকিয়ে রইল বিজয়ের মুখে দিকে।

বিজয় বলল, ব্যাপার একটু গুরুতর। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। চল এসব কথা বাড়ি বসে হবে না, অন্য কোথাও যাই।

মিহির বলল, তুই বড়ো বেরসিক রে! বোস, আগে চা-টা খা, তারপর অন্য কথা। এই বলেই মিহির চিৎকার করে বাড়ির ভিতরের উদ্দেশে ডাকল, মা, বিজয় এসেছে। আর এক কাপ চা পাঠিয়ে দাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক কাপ চা ও সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে মিহিরের মা সুনীতিদেবী নিজেই এসে উপস্থিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী বিজয়, কেমন আছ?

বিজয় মুখে একটু কৃত্রিম হাসি ফুটাবার চেষ্টা করে বলল, এই মাসিমা চলে যাচ্ছে—

বাড়ির সবাই ভালো তো?

হ্যাঁ, ভালো।

বাড়িটা কেমন, পছন্দ হয়েছে তো?

হয়েছে বই কি। আপনি তো গেলেন না— কথাটা শেষ করতে গিয়েও বিজয়ের মুখে আটকে গেল।

সুনীতিদেবী সেই অসমাপ্ত কথার জের টেনেই বললেন, ভাবছিলাম, একদিন গিয়ে তোমাদের বাড়িটা দেখে আসব। সময় করতে পারছি না। তোমার সঙ্গেই পরে একদিন যাব।

বিজয় বলল, তা বেশ, যাবেন বই কি। আমিই এসে একদিন নিয়ে যাব।

বেশ, তাই হবে। এখন যাইবাবা, রান্নাঘরে অনেক কাজ রয়েছে।

সুনীতিদেবী চলে গেলেন। মিহির ও বিজয় বসে চা খেতে লাগল। খাওয়া শেষ না হওয়া অবধি কেউ কোনও কথা বলল না। ঘরের আবহাওয়াটাও যেন ভারী হয়ে উঠল।

চা খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর বিজয় বলল, চল, বাইরে কোনও রকে বা পার্কে গিয়ে বসি। এখানে ওসব কথা নিয়ে আলোচনা ঠিক করা হবে না।

মিহির অনুমান করতে পারল, কী আলোচনা বিজয় করতে চায়। তবু না জানার ভান করে জিজ্ঞেস করল, এমন কী আলোচনা রে?

বিজয় বলল, আলোচনাটা একটু গুরুতর। বাড়িতে মেয়েরা রয়েছে, তাদের মনে নানা সন্দেহ জাগতে পারে।

মিহিরের মনে কিন্তু কোনও সন্দেহ রইল না। পরিষ্কার বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই কাল রাত্রে ওই বাড়িতে কোনও ভূতুড়ে কাণ্ড হয়েছে, যার জন্য ছুটে এসেছে বিজয়। তাই বলল, বেশ, তা হলে চল কোনও নিরিবিল জায়গায় গিয়ে বসি।

কিছুদূর গিয়ে ছোট্ট একফালি পার্ক। সেখানে একটা ভাঙা বেঞ্চির পাশে দুজন বসল। মিহির বলল, কাল তুই চলে আসবার কিছুক্ষণ পরেই আমি বাজারে যাবার জন্য বের হলাম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাত্র কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় একটি লোকের সঙ্গে দেখা। লোকটি দূর থেকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে বলল, মশাই, আপনি বুঝি ১৪।৪।১-বি বাড়িটায় থাকেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ। লোকটি বলল, ওটা তো হানাবাড়ি!

আমি চমকে উঠে। জিজ্ঞেস করলাম, হানাবাড়ি। বলছেন কী মশাই?

লোকটি বলল, হ্যাঁ, যে আসে সে তো তিন-চার দিনের বেশি থাকতে পারে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন? কে এসে হানা দেয়?

লোকটি বলল, তা আর বুঝতে পারছেন না? ও বাড়িতে যারা থাকবে তারাই ওর খপ্পরে পড়বে। পরিবারের লোকের মঙ্গল চান তো ভালোয় ভালোয় কোথাও উঠে যান।

মিহির জিজ্ঞেস করল, তুই লোকটাকে কী বললি?

বিজয় বলল, আমি আর কী বলব? কথা শুনে তো আমার হৃৎকম্প হতে লাগল।

বিজয় বলল, একটু রোগা, গালাচাপা ভাঙা, পরনের কাপড়-জামা আধময়লা।

মিহির উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, তাহলে এটা নিশ্চয় ভজহরি, বাড়ির দালাল। তোকে ভয় দেখাবার জন্য এসেছিল।

বিজয় জিজ্ঞেস করল, আমাকে ভয় দেখাবে কেন?

মিহির বলল, তোরা বাড়ী ছেড়ে গেলে অন্য ভাড়াটের কাছ থেকে সে সেলামি নেবে। লোকটা ভারি বজাত। ওর কথা বিশ্বাস করিসনি।

বিজয় বলল, বিশ্বাস আমি প্রথমে করিনি। কিন্তু তারপর রাত্রে যা ঘটনা ঘটল তাতে অবিশ্বাস করার মতো কোনও কারণ তো দেখছি না।

মিহির জিজ্ঞেস করল, রাত্রে কী ঘটনা ঘটল আবার?

বিজয় বলল, জনিস বোধহয় আমার ঘুম গাঢ়। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাও বলতে পারিস। রাত্রে নাকি ঘরের পিছনের দিকে কী ঘোরাঘুরি করে। তার পায়ের শব্দ শোনা যায়।

তুই শুনেছিস ?

আমি কী করে শুনব? বললাম তো আমার কুম্ভকর্ণের নিদ্রা।

তবে কে শুনেছে?

মা শুনেছেন। তিনি নাকি প্রথম দিনও শুনেছিলেন। অত খেয়াল করেননি। কালকে শুনেই চুপি চুপি দরজা খুলে বেরিয়েছিলেন।

তারপর? উনি দেখিলেন?

না। দেখলেন না। শব্দ থেমে গেল। আবার এসে ঘরে শুলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার শব্দ। আবার বেরিয়ে এসে দেখেন-কিছু নেই। বড়ো রহস্যজনক আর ভয়ের ব্যাপার। মা মনে হয় বেশ ভয় পেয়েছেন।

ভজহরি কাল সকালে তোকে যা বলেছিল, সে কথা তোর মাকে বলেছিস নাকি?

না, সেকথা বললে তো মা আজই বাড়ি ছাড়বার জন্য পাগল হয়ে যেতেন। এখন কী করি বলা তো?

মিহিরের মুখ দিয়ে কোনও কথা বের হল না। কী জবাব দেবে সে?

অনেকক্ষণ পর মিহির একটা সাময়িক সমাধান খুঁজে পেল।

বলল, আজ আমি তোদের বাড়িতে গিয়ে রাত্রিবেলায় থাকব। নিজে ব্যাপারটা ভালো করে দেখতে চাই। তারপর একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

বিজয় বলল, আচ্ছা, তাই হবে। তবে আজ থেকেই অন্য একটা বাড়ির খোঁজ করতে হবে। কারণ, বুঝতেই পারা যাচ্ছে ওই বাড়িতে থাকা চলবে না।

মিহির বলল, কিন্তু জানিস, কলকাতায় বাড়ির কী সমস্যা। মাথা কুটেও বাড়ি পাওয়া যায় না।

বিজয় বলল, হ্যাঁ, তা জানি। কিন্তু তাই বলে ভূতুড়ে বাড়িতে থাকা—

মিহির বলল, দরকার হলে ভূত তাড়িয়ে নিজেরা বাস করব।

বিজয় আঁতকে উঠে বলল, সর্বনাশ! কী যে বলিস।

হ্যাঁ, সত্য কথাই বলছি। আজকে তোকে একটা কাজ করতে হবে। দোতলার ঘরটা আরও ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে।

কেন? ওই ঘরেই আজ শুবি নাকি?

হ্যাঁ, সেই ঘরেই আজ রাত্রে শোব।

সর্বনাশ, আমাকেও শুতে হবে।

কেন, ভয় পাচ্ছিস বুঝি?

বিজয় কোনও জবাব দিল না।

মিহির বলল, বেশ, আমাকে একা একা ঘরে শুইয়ে রেখে যদি তুই খুশি হোস। তবে তাই করিস।

না তা নয়, তোকে একা রেখে আমি কি ঘুমোতে পারি? বেশ আমি আজই লোকজন নিয়ে ভালোভাবে ঘরটা পরিষ্কার করব।

মিহির বলল, আচ্ছা এখন যা, সন্ধ্যার পর তো আমি যাচ্ছি।

বিজয় বলল, নিশ্চয় কিন্তু যাবি। মনে থাকে যেন।

থাকবে, থাকবে।

সন্ধ্যার অনেক পরে মিহির বিজয়দের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হল। দেরি দেখে বিজয় একটু ঘাবড়েই গিয়েছিল। ছোটোখাটো নানা ঘটনা ঘটার পর থেকে বিজয় যেন নিজেকে একটু অসহায় বলেই মনে করছে।

মিহিরকে দেখে বিজয় একটু যেন নিশ্চিন্ত হল।

হ্যাঁ।

কোনও আলোচনাই তারা আর করল না। শুধু বিজয়কে এক সময় বলল, তোর টর্চলাইট আছে? একটা বেশ জোরালো টর্চলাইট চাই।

বিজয় বলল, খুব জোরালো নেই, তবে একটা টর্চলাইট আছে।

মিহির বলল, বেশ, তাতেই কোনওরকমে হবে। শোবার সময় আমার বালিশের কাছে রেখে দিবি।

বিজয় জিজ্ঞেস করল, টর্চলাইট দিয়ে ভূতকে ফলো করবি নাকি?

মিহির জবাব দিল, দরকার হলে করব।

বিজয় বলল, সর্বনাশ, ওসবের মধ্যে কিন্তু আমাকে টানবি না।

মিহির হেসে উঠল। তাকিয়ে দেখলে ঘরে কেউ নেই। তাই বলল, এই সাহস নিয়ে ভূতের বাড়িতে বাস করিস?

বিজয় বলল, সত্যি যদি ভূতের বাড়ি হয় তা হলে কিন্তু আমি নাচার। পালাবার পথ পাব না।

মিহির বলল, আমি একই না হয় ভূতের সঙ্গে লড়ব। আমার সেই সাহস আছে।

বিজয় এবার মনে একটু ভরসা পেল। খাওয়াদাওয়ার আগেই মিহির বিজয়কে নিয়ে পরিষ্কার করা ঘরটি দেখে এল। বিজয় বলল, কী নোংরা যে ঘরটা হয়েছিল তা আর কী বলব। এক মন ধুলো বেরিয়েছে আর বেরিয়েছে শ-খানেক আরশোলা। তা ছাড়া পাখির পালক আর ভাঙাচোরা জিনিস যে কত বেরিয়েছে।

মিহির বলল, এটা দম বন্ধ করা ঘর। কালকেই তা বুঝতে পেরেছি। দরজা-জানালাগুলো খুলে রাখ। আর একটা হ্যারিকেন জ্বলিয়ে রাখা ঘরের মধ্যে। তা হলে ঘরের বিচ্ছিরি বেঁটক গন্ধটা চলে যাবে।

বিজয় তাই করল।

খাওয়াদাওয়ার পর ঘুমোবার পালা। নীচের ঘরের তক্তপোশটা কালকেই সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার ওপরেই বিছানা করা হল।

শোবার সময় হতেই যেন বিজয়ের মনটা কেমন করতে লাগল। আজ কী অঘটন ঘটবে কে জানে ।

মিহির ব্যঙ্গ করে বলল, কী রে, আমাকে কি একাই এই ঘরে ঘুমোতে হবে না, তুইও থাকিবি?

বিজয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, না, একা ঘুমোবি কেন, আমি তো সঙ্গেই আছি।

সে কথা মনে থাকে যেন। রাত্রিবেলায় উঠে আবার পালিয়ে যাবি না তো?

না হে না, অত ভিতু আর বিশ্বাসঘাতক আমাকে মনে কোরো না।

দুজনেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। বিজয় বলল, বাতিটা জ্বালানোই থাক, বরং একটু ডিম করে দিই।

মিহিরের আবার ঘরে আলো থাকলে ঘুম আসে না। তবু সে কোনও আপত্তি করল না। বিজয়ের অবস্থার কথা বিবেচনা করেই সে একটু কষ্ট স্বীকার করতে রাজি হল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুজনের চোখে কোনও ঘুম নেই, তারপর কখন যে ঘুম এল কেউ হয়তো জানে না।

মিহিরের ঘুম আগে ভাঙল। তার চোখের ঘুম একটু পাতলা। কিন্তু জেগেই দেখল ঘরে আলো নেই। কখন নিভে গেছে কে জানে।

ঘুম ভাঙল তার একটা শব্দ শুনেই।

মনে হল ঘরে যেন কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মিহির পাশে হাত বুলিয়ে দেখল—বিজয় অঘোরে ঘুমোচ্ছে তার পাশে শুয়ে। তা হলে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে?

মিহির টর্চটা জ্বালল। কিন্তু ঘরে কেউ নেই তো। ঘর ফাঁকা।

তাহলে কীসের শব্দ?

নিশ্চয় সেই অশরীরী প্রেতাত্মা।

টচটা নিভিয়ে মিহির আবার শুয়ে পড়ল। বিজয়কে ডাকল না। ডাকলে হয়তো সে ভয় পাবে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়।

এবার কিন্তু সহজে ঘুম এল না মিহিরের।

সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ সমস্ত পল্লী। একটা রাত-জাগা পাখির ডাকও পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

সময়ের পর সময় যেন নিঃশব্দে পা ফেলে চলতে লাগল। আবার পায়ের শব্দ-আরও জোরো-আরও কাছে। মিহির সহসা টর্চিটা জ্বালল না। অন্ধকারেই পায়ের শব্দটা অনুমান করতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ একটা দড়াম করে শব্দ ঘরের মধ্যে যেন কিছু একটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

মিহির ধড়মড় করে উঠে পড়ল বিছানার ওপর। টর্চটা জ্বালাল। ওদিকে তক্তাপোষের ওপর একটা প্রবল ঝাঁকানিতে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভেঙে উঠে পড়ল বিজয়।

মিহিরের পাশে বসে বিজয় জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে রে?

মিহির টর্চের আলো ঘরের চারদিকে ফেলতে লাগল। তারপর ফেলতে লাগিল মেঝের ওপর। কিছুক্ষণ পর তক্তাপোষের কাছেই মেঝের এক জায়গায় টর্চের আলোটা স্থির হয়ে পড়ল।

মিহির বলল, ওই দেখ।

বিজয় কৌতুহলী হয়ে সেদিকে তাকিয়ে বলল, ঘরের চুনবালির আস্তর খসে পড়েছে রে। আর কিছু পড়েনি তো?

বোধহয়, না।

বিজয়ের চোখে ঘুম ছড়িয়ে এসেছিল। বলল, এখন আমি ঘুমিয়ে পড়তে পারি কি?

মিহির বলল, হ্যাঁ, তুই আরামে নিদ্রা যেতে পারিস।

পরদিন ভোরে উঠে মিহির বলল, ওপর থেকে চুনবালির ওই বিরাট চাপড়াটা আমাদের গায়েও পড়তে পারত।

বিজয় বলল, পড়তে পারত বই কি! বাড়িটা ভয়ানক পুরোনো। তা ছাড়া এই ঘরটা যেন আরও জরাজীর্ণ।

মিহির বলল, এই ঘরটা তো আর আগে তৈরি হয়নি। বাড়ির সঙ্গেই এক সময়ে তৈরি হয়েছে।

বিজয় বলল, এই ঘরটা সব সময় বন্ধ থাকে। কিনা, তাই এই দশা। বাড়িটা একটু রিপেয়ার করে চুনকাম করা দরকার। তারপর একটু থেমে মিহিরকে জিজ্ঞেস করলে, আর কিছু দেখেছিস নাকি? না ওই শব্দ শুনেই জেগে উঠেছিস?

মিহির বলল, পরে সে কথা বলব। তবে কালকেই গোটা বাড়িটা ভালো করে চুনকাম করে ফেলি।

বিজয় বলল, দুটো ঘর তো হোয়াইটওয়াস করাই আছে। শুধু এই ঘরটা আর বারান্দার দিকটা করলেই চলবে।

মিহির বলল, ওটা তো দায়-সারা গোছের হোয়াইট-ওয়াস করা। এ বাড়িতে থাকতে হলে ভালো করে করতে হবে।

বিজয় বলল, যদি থাকি তবে তো? তা না হলে এত খাটুনির দরকার কী?

মিহির বলল, এই বাড়িতেই থাকতে হবে। ভাবনার কিছু নেই। ভূতকে তাড়াতে আমাদের বেশি সময় লাগবে না।

বিজয় বলল, তা হলে রাজমিস্ত্রিকে খবর দিই। রঙের দোকানে খবর দিলেই লোক চলে আসবে।

মিহির বলল, শুভস্য শীঘ্রং। আজকেই ব্যবস্থা কর।

বিজয় তখনই বাজার করতে গিয়ে রঙের দোকানে খবর নিয়ে এল। দু-তিন জন রাজমিস্ত্রি তাদের যন্ত্রপাতি ও মালমশলা নিয়ে হাজির হল। ভোরবেল বিজয় ও মিহির ঘর। থেকে বেরোবার সময় দরজা বন্ধ করে

দিয়েছিল। রাজমিস্ত্রিরা এসে ঘর খুলল। খুলেই বলল—এ কী! ঘরটা এমন কেন? ময়লা আবর্জনা আর জঞ্জালে ভরতি!

রাজমিস্ত্রিদের কথা শুনে বিজয় বলল, তোমরা এ কী বলছি? ঘরে জঞ্জাল আসবে কোত্থেকে?

রাজমিস্ত্রিরা বলল, আমরা কি মিথ্যে কথা বলছি বাবু? আপনারা নিজের চোখেই এসে দেখুন না।

বিজয় আর মিহির তো অবাক। কালকের পরিষ্কার করা ঘর আজকেই এত নোংরা কী করে হল? এক ঘণ্টা আগেও তো পরিষ্কার ছিল।

তবে?

অদৃশ্য শক্তি

বিজয় আশ্চর্য হয়ে গেল ঘরের ব্যাপার দেখে। ঘরে কোনও জনপ্রাণী ঢোকেনি, কোনও পাখি ঢুকবার জায়গা নেই, তবু এমন অবস্থা কেন হল? নিশ্চয়ই অদৃশ্য কোনও কিছুর কাণ্ডকারখানা।

মিহির ভেবেছিল সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই চলে যাবে, কিন্তু তার যাওয়া হল না। ভাবল, আজ অফিস কামাই দিয়ে এখানেই থাকবে। প্রয়োজন হলে রাত্রেও থাকবে এখানে। তার মনের ভেতর যেসব সন্দেহ উকিঝুকি মারতে লাগল, সে সম্বন্ধে বিজয়কে সে কিছুই বলল না। রাজমিস্ত্রিদের বলল,—তোমরা কাজে লেগে যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।

রাজমিস্ত্রিরা ভেবেছিল চুনকাম করলেই হয়ে যাবে। কিন্তু এখন দেখল বালিসিমেন্টের কাজও রয়েছে প্রচুর। তাই বালি সিমেন্টের ফর্দ দিয়ে তারা কাজে লেগে গেল।

বিজয় চলে গেল বালি সিমেন্ট আনতে। রাজমিস্ত্রিরা কর্নিক ও হাতুড়ি দিয়ে ক্ষয়ে যাওয়া ঘরের দেওয়াল ও ছাদের আস্তরণগুলো খসাতে লাগল।

কুলির মাথায় করে বিজয় সিমেন্ট ও বালি নিয়ে এল বেশ কিছুক্ষণ পরে। মিহির তখন রাজমিস্ত্রিদের কাজ দেখাশোনা করছে।

ঘরটা অন্ধকার। দিনের বেলায়ও বাতি জ্বালবার দরকার হয়। তবু রাজমিস্ত্রি দুজন কাজ করতে লাগল। এরকমভাবে কাজ করা তাদের অভ্যাস আছে।

বিজয় ফিরতেই রাজমিস্ত্রিরা বলল, —বাবু এত কাজ এক দিনে করা সম্ভব হবে না। অন্তত তিন দিন লাগবে।"

বিজয় বলল—তিন দিন? এ কী কথা বলছি তোমরা? এতদিন লাগবে কেন?

রাজমিস্ত্রি বলল—হ্যাঁয়া বাবু, যেদিক দিয়ে ধরছি, সেদিক দিয়েই খসে পড়েছে। যদি বলেন তো কাজ ধরি, না হয়। এখানেই ক্ষান্ত দিই।

বিজয় মিহিরকে জিজ্ঞেস করল, —কী রে, কী করব?

মিহির বলল, —কাজ যখন শুরু করেছিস তখন শেষ করেই নে। আধখানা করে লাভ কী?

রাজমিস্ত্রিরা আবার কাজে লেগে গেল। দুপুরবেলা মিহিরের আহারের ব্যবস্থা হল বিজয়দের বাড়িতেই। স্নান করে খেয়ে-দোয়ে একটু বিশ্রাম করে আবার তারা গেল রাজমিস্ত্রিদের কাজ দেখতে। তখন রাজমিস্ত্রিরা ঘরের উপরের ছাতের দিকটার কাজ অর্ধেকও করে উঠতে পারেনি।

মিহির বলল—এ কী, তোমরা এতক্ষণে অর্ধেকটাও করতে পারেনি?

রাজমিস্ত্রিরা বলল—কী করে করব বাবু, আপনাদের বাড়ির লোকেরাই তো কাজ করতে দেয় না।

বিজয় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—কাজ করতে দেয় না মানে? আমাদের বাড়ির কে তোমাদের কাজে বাধা দেয়?

একজন রাজমিস্ত্রি বলল—আপনাদের বাড়ির সবাইকে কি আমরা চিনি বাবু? আর কাজ ফেলে এত চোখে চোখে রাখবার সময় কি আমাদের আছে?

বিজয় এই কথার কোনও অর্থ বুঝতে পারল না। জিজ্ঞেস করল—তোমরা কী বলতে চাও ভালো করে বলে।

রাজমিস্ত্রি বলল—বাবু, আমরা বাঁশের আড়ায় বসে কাজ করি। কেউ যদি বারবার ঝাঁকায় তাহলে কি কাজ করা যায়?

সে কথা শুনে বিজয় এবং মিহির দুজনেই অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল—কে তোমাদের আড়ায় এসে ধাক্কা মারে? আমাদের বাড়িতে তো সে-রকম ছেলে বা কোনও লোক কেউ নেই।

রাজমিস্ত্রিরা বলল—সে কী কথা কর্তা! আমরা তো আপনাদের বাড়ির লোক বলেই কিছু বলিনি। শুধু দু-এক বার ধমক দিয়েছি মাত্র।

বিজয় জিজ্ঞেস করল—সেই লোককে তোমরা নিজের চোখে দেখেছ?

রাজমিস্ত্রি বলল—অত কি তাকিয়ে দেখবার সময় আছে কর্তা! আমরা ধমক দিতেই বা তাকাতেই ছুটে পালিয়ে যায়। শুধু ছায়াটাই দেখেছি।

সে কথা শুনে বিজয় এবং মিহির দুজনের মনেই রোমাঞ্চ জেগে ওঠে। তারা মনে মনে ভাবতে লাগল অনেক কিছু। কিন্তু রাজমিস্ত্রিদের কিছু বুঝতে না দিয়েই বলল—বেশ তোমরা কাজ করে যাও, আমরা এখন এখানেই আছি।

মিস্ত্রিরা কাজ করতে লাগল। বিজয় আর মিহির বসে বসে তাদের কাজ দেখতে লাগল। কিন্তু কতক্ষণ একভাবে বসে থাকা যায়! ঝিমুনি এল দুজনেরই।

ঠিক সেই সময়েই ঘটে গেল এক অভাবনীয় ব্যাপার। হুড়মুড় করে শব্দ হল, আর সঙ্গে দুজন রাজমিস্ত্রিই বাঁশের আড়া থেকে পড়ে গেল নীচে।

কী হল? কী হল? বাড়ির অন্যান্য লোক ছুটে এল। মিহির আর বিজয় দুজনেই হতভম্ব। এমন একটি ব্যাপারে যে কী করে ঘটল তা তাদের কল্পনাতেই আসে না।

রাজমিস্ত্রি দুজন খুব আঘাত পায়নি। চোখে-মুখে জলের ছিটে দিয়ে ও প্রাথমিক চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলা হল।

বিজয় বলল—থাক, আজ তোমাদের আর কাজ করতে হবে না। বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করো। কাল সকলে আবার এসো।

রাজমিস্ত্রি দুজনের শরীর তখনও কাঁপছে। তারা বলল—না কর্তা, আমরা আর কাজ করতে পারব না। আমাদের মজুরি চুকিয়ে বিদায় করে দিন।

মিহির জিজ্ঞেস করল—সে কী, তোমরা কাজ করবে না কেন?

কাঁদোকাঁদো স্বরে রাজমিস্ত্রিরা বলল—এমনভাবে কি কাজ করা যায় বাবু? আপনারা ঘরে রয়েছেন তবু আমাদের কেমন করে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল।

ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো? কারা? অবাক হয়ে প্রশ্ন করল মিহির ও বিজয়।

সে কি আমরা দেখেছি? আপনার নীচে বসেছিলেন, আপনারাই তো দেখেছেন। এমনভাবে আমরা কাজ করতে পারব না। শেষে একটা খুন-খারাপি হয়ে যাবে। আমাদের পয়সা মিটিয়ে দিন বাবু, আমরা চলে যাই। অন্য লোক এনে কাজ করান।

কাজ যখন কিছুতেই করবে না। তখন আর কীভাবে তাদের রাখা যায়? বিজয় হিসাব করে তাদের মজুরি মিটিয়ে দিল। কিন্তু অবাক হয়ে ভাবতে লাগল-এর পেছনে কী রহস্য আছে? কী রহস্যই বা থাকতে পারে!

মিহির সন্ধ্যার পর নিজের বাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যে ঘরে রাজমিস্ত্রিরা কাজকর্ম করছিল সেই ঘর চুনসুরকিতে ভরতি। কাজেই রাত্রে স্থানাভাব ঘটবে, এই অজুহাতে মিহির বাড়ি চলে যেতে চাইল। বিজয় বলল-না, আজ রাতটা তুই থেকে যা। মনে হয় আজ অনেক কিছু ব্যাপার ঘটবে।

মিহির জিজ্ঞেস করল—কী করে বুঝলে?

বিজয় বলল—দিনের বেলাতেই যখন এমন উৎপাত তখন রাতের বেলা যে কী করবে: কে জানে। আমার কী মনে হয় জানিস?

—কী মনে হয় ?

মনে হয়। ওদের আস্তানায় আমরা হানা দিয়েছি বলেই ওরা খেপে উঠেছে।

মিহির কোনও জবাব দিল না। চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগল। বিজয় বলল—কাজেই আমাদের সতর্ক থাকা দরকার। এখন যে কোনওরকম আক্রমণ আসতে পারে। আমাদের তৈরি থাকতে হবে।

সেদিন রাত্রিটা বিজয়ের খুব ভয়ে ভয়েই কাটল। তার সব সময়েই মনে হতে লাগল, ভূতের আস্তানায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে বলেই তারা খেপে উঠেছে।

তবু যে ভয় সে করেছিল, সে রকম ভয়ের কিছু ব্যাপার রাত্রিবেলায় ঘটল না। খুব ভোরেই বিজয়ের ঘুম ভেঙে গেল। তখন বাড়ির বৌ ছাড়া

কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। ঘুম থেকে ওঠার পরই কিন্তু গা-টা ছমছম করতে লাগল বিজয়ের। তার কেন জানি মনে হতে লাগল বাড়িতে কী যেন একটা ঘটেছে। প্রথমেই সে গেল সেই ঘরে—যে ঘরে কাল রাজমিস্ত্রিরা কাজ করছিল।

দরজাটা কাল রাত্রে বন্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু গিয়ে দেখল দরজার দুটি পাটই হাঁ করে খোলা ।

বিজয় তা দেখে অবাক হয়ে গেল। ঝিকে জিজ্ঞেস করল—তুমি কি এই ঘরের দরজা খুলেছ?

ঝি অবাক হয়ে বলল—আমি দরজা খুলিব কেন? ও ঘরে আমার কি কোনও কাজ আছে?

বিজয় বিস্মত হয়ে ভাবল, তা হলে এই ঘরের দরজা খুলল কে?

ঘরে ঢুকে বিজয়ের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কাল যে ঘরের উপরের দিকটা বালি ও সিমেন্ট দিয়ে আস্তর করা হয়েছিল আজ তা সব করে পড়ে গেছে। মনে হয় কে যেন খামচিয়ে ওগুলো ফেলে দিয়েছে। এখানে ওখানে এবড়ো-থেবড়ো দাগ ।

বিজয়ের মনে কোনও সন্দেহ রইল না। এখানে নিশ্চয়ই অশরীরী প্রেতাত্মার আস্তানা রয়েছে।

নাঃ, এ বাড়িতে কিছুতেই থাকা সম্ভব নয়।

হঠাৎ বুড়ির কথা তার মনে হল। একা এই বাড়িতে কীভাবে সে থাকে? তার কি কোনও ভয়-ডর নেই? বাড়িতে এমন উপদ্রব হয়। সে কী করে তা সহ্য করে? তার উপর কি কোনও উপদ্রব হয় না?

বিজয় ঠিক করল, এই সব কথা বুড়িকে গিয়ে জানাবে। তাই সে বুড়ির ঘরের দিকে চলল ।

বুড়ির ঘরের দরজাও খোলা। দরজার সামনে পা দিয়েই সে চমকে উঠল। ভাবল চিৎকার করে উঠবে। কিন্তু মুখের ভাষাও যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সে কি মরে গেছে? না তার অন্য কিছু হয়েছে? বিজয় এসে তার মাকে খবর দিল। মলিনাদেবী খবর শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন। সঙ্গে ঝি-ও গেল। গিয়ে দেখলেন অস্বাভাবিক অবস্থায় মাটির উপর পড়ে আছে সেই বুড়ি। দু-চোখ তার খোলা। কটমট করে সে যেন সবার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখলেই ভয় হয়।

বুড়ির সৎকার

এই আত্মীয়হীনা বৃদ্ধাকে নিয়ে কী করবে তা ভেবে খুবই বিব্রত হয়ে পড়ল বিজয়। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ভজহরি এসে উপস্থিত হল। বিজয় যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ভজহরি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বুড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, ভূতেই ওকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে।

সে কথা শুনে সবাই চমকে উঠল। মলিনাদেবী বলে উঠলেন, এটা কি ভূতের বাড়ি।

যে সন্দেহ সবার মনে কয়েকদিন ধরে উঁকিঝুঁকি মারছিল সেটা যেন এক মুহূর্তেই প্রকাশ হয়ে পড়ল।

ঝি 'ও মাগো' বলে সেইখানেই মূর্ছা গেল। তাকে নিয়েই তখন বেধে গেল হুলস্থূল কাণ্ড। ভজহরি বলল, আপনারা কিছু ভাববেন বা বাবু। আমি লোকজন এনে এর সৎকারের ব্যবস্থা করছি।

ভজহরি চলে গিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই লোকজন জোগাড় করে ফিরে এল।

মিহির কাল চলে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হল। বুড়িকে দেখে ও সব কথা শুনে সে একেবারে হতভম্ব। তারপর যে রাজমিস্ত্রিরা কাজ করেছিল। সেই ঘরের অবস্থা দেখে তার মুখ দিয়ে বাক্যস্ফুট হল না।

ভজহরির লোকজনেরা বুড়িকে বাইরে বের করে নিয়ে এল। ভজহরি তালা লাগিয়ে দিল দরজায়। তারপর বুড়িকে বেঁধেছেদে শ্মশানে নিয়ে গেল। এই ঘটনার পর বাড়ির আবহাওয়াটা যেন আরও ভারী হয়ে উঠল।

বিজয় মিহিরকে জিজ্ঞেস করল, কী রে তোর কী মনে হয়?

মিহির বলল, মনে হয় তো অনেক কিছু, কিন্তু ব্যাপারটা খুব ভেবেচিন্তে দেখতে হবে।

বিজয় বলল, ভাবনাচিন্তার আর কিছু নেই, এই বাড়িতে আর থাকা চলবে না।

এদিকে বাড়ির ঝি কেঁদেকেটে সারা। এই ভূতের বাড়িতে সে আর থাকবে না। সত্যি সে আর রইল না। বিজয় বলল, দেখলি ব্যাপারটা কেমন ঘোরালো হয়ে উঠছে শিগগির ব্যবস্থা না করলে আর উপায় নেই। তুই ব্যাপারটার মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছিস না।

মিহির বলল, গুরুত্ব আমি খুবই দিচ্ছি অর্থাৎ এখন দিতে বাধ্য হচ্ছি। তবে আর একটা দিন আমাকে সময় দে। কালকের মধ্যে হেস্তনেস্ত একটা করে ফেলব।

বিজয় বলল, কিন্তু এখন এখানে একটা দিন যে একটা বছর বলে মনে হচ্ছে।

মিহির বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে। কোনও ভাবনা নেই।

বিজয় বলল, আজ কিন্তু তোকে এ বাড়িতে থাকতেই হবে। আমি একা থাকতে আর ভরসা পাচ্ছি না। আজ রাত্রে হয়তো বুড়িই ভূত হয়ে আমাদের গলা টিপে মারতে আসবে।

মিহির হাসতে হাসতে বলল, বেশ আমি থাকব।

বিজয় একটু আশ্বস্ত হল। বলল, আজকের রাতটা ভালোয় ভালোয় কাটলে বীচি।। কোনও অঘটন না ঘটলেই হয়।

সেদিন রাত্রে সত্যি কোনও অঘটন ঘটল না। রাতটা নিরুপদ্রবেই কেটে গেল।

মিহির পরদিন ভোরে উঠে হাসতে হাসতে বলল, তোর ভূতেরা টায়ার্ড হয়ে পড়েছে, তাই একটু রেস্ট নিচ্ছে।

একটু পরেই ভজহরি এসে উপস্থিত হল। মিহির তাকে বলল, ওহে ভজহরি, তোমাদের বুড়ি তো অক্কা পেয়েছে। এখন বাড়িওয়ালার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করে দাও। ভাড়া কার কাছে দেব?

ভজহরি বলল, "আমার কাছে দিলেই হবে বাবু। কোনও গোলমাল হবে না।

মিহির বলল, তা তো বুঝি। কিন্তু বাড়িওয়ালার সঙ্গে আমাদের অন্য দরকার আছে।

ভজহরি বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। বাড়িওয়ালার লোক তো কলকাতায় থাকে না। এসেছে কি না খোঁজ নিয়ে আসব। তারপর কাল না হয় দেখা করবেন।

মিহির বলল, বেশ তাই হবে।

ভজহরি বুড়ির ঘরে কাল তালা লাগিয়ে চাবি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। একটু পরে তালা খুলে ভেতরে গিয়ে অনেকক্ষণ কী যেন কাজকর্ম করল তারপর কয়েকটা পোটলা পুঁটুলি নিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে চলে গেল।

হাতিয়ে নিয়ে চলে গেল। তবে ব্যাপারটা বড়েই রহস্যজনক। বুড়ির তিনকুলে কেউ আছে কি না তাও জানি না।

বিজয় বলল, জেনেই বা কী হবে? আমরা যখন এই বাড়িতে থাকিবই না, তখন ওর জাত-গোত্র জেনে লাভ কী?

এমনকি বাড়ির রহস্যও কিছু বেরিয়ে পড়বে।

বিজয় বলল, তাতে কী লাভ হবে?

মিহির বলল, কয়েকদিনের মধ্যেই এই বাড়ির রহস্য আমি বের করে ফেলব। সেদিক দিয়ে আমি অনেকটা এগিয়েও গিয়েছি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ শিগগিরই দেখতে পাবি। মনে মনে আমি সব প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছি।

ভজহরি বড়ো সেয়ানা লোক। সে ভেবেছিল নিজেই ভাড়ার টাকাগুলো আত্মসাৎ করবে। বুড়ি মরে গেছে, এখন ভাবনা কী? তাই বলল, বাড়ির মালিককে তো পাওয়া যাবে না।

আমরা বাড়িও ছাড়ব না, ভবিষ্যতে ভাড়াও দেব না।

ভজহরি দেখল, ভারী তো মুশকিল হল। তাই বলল, আচ্ছা চলুন, দেখি যদি পাওয়া যায়।

মিহির ও বিজয়কে নিয়ে ভজহরি বাড়িওয়ালার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। বাড়িওয়ালা নিঃসন্তান, তার স্ত্রীও মারা গেছেন। তাই তিনি বাইরে থাকেন। তীর্থে তীর্থে ঘোরেন। বাড়িওয়ালার একজন কর্মচারী থাকেন। সেই বাড়িতে, নাম রমেন্দ্রনাথ, বয়স পঞ্চাশের ওপরে।

মিহির বলল, দেখুন, বাড়িটা ভাড়া নিয়ে আমরা বড়ো অশান্তি ভোগ করছি। কলকাতা শহরে এত বড়ো একটা বাড়ি এমন অবস্থায় পড়ে আছে, আপনারা কোনও ব্যবস্থা করেন। না কেন?

রমেনবাবুবললেন, যার করা উচিত তার কোনও গরজ নেই, আমি কেন মিছিমিছি করতে যাব?

বিজয় বলল, ভাড়া দিয়ে বেশ কিছু উপার্জন করাও তো যায়?

রমেনবাবু বললেন, উপার্জন করার স্পৃহা বাড়িওয়ালার নেই। কোনও ভাড়াটে ও— বাড়িতে বেশিদিন থাকতে পারে না। আমি ছ-বছর ধরে দেখাশোনা করছি কিন্তু আমিও বিরক্ত হয়ে পড়েছি।

মিহির জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, বাড়ির ব্যাপারটা কী বলুন তো?

রমেনবাবু বললেন, ব্যাপারটা আমার কাছেও রহস্যজনক। কাজেই আমি নিজের গরজে কিছু করতে চাই না।

মিহির কিছুক্ষণ কী ভেবে বলল, "আচ্ছ, যদি অন্য বাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত আমরা আরও কিছুদিন থাকি, তা হলে ভাড়ার বিষয়ে কী ব্যবস্থা করবেন?

রামবাবু বললেন, যতদিন খুশি থাকুন। ভাড়া আপনারা যা খুশি তাই দেবেন। আর এই নিন দোতলার চাবি। সব ঘরই আপনারা ব্যবহার করতে পারেন।

বিজয় বলল, দোতলার চাবি তো আমরা আগেই পেয়ে গেছি।

রমেনবাবু বললেন, না, এই চাবি আপনারা পাননি। এই চাবি শুধু আমার কাছেই আছে।

—এটা আবার কোন চাবি?

—দোতলার সামনের ঘরে আপনারা ঢুকেছেন, সঙ্গে পার্টিশন করা আর একটা ঘর। আছে। ঘরের মাঝখানে দরজাটা দেখেননি?

—হ্যাঁ দেখেছি। কিন্তু ওই ঘরের দরকার নেই বলে আমাদের কোনও কৌতূহল জাগেনি।

চাবিটা বিজয়ের হাতে দিয়ে রমেনবাবু বললেন, এই নিন। ঘরটা খুলে ব্যবহার করুন।

বিজয় বলল, ধন্যবাদ।

কথাবার্তা বলার আগে রমেনবাবু, ভজহরিকে চলে যেতে বলেছিলেন। কাজেই সে সবকিছু জানতে পারল না। পথে বেরিয়ে একটু এগিয়ে যেতেই মিহির ও বিজয়ের সঙ্গে তার দেখা হল।

বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল ভজহরি। তাদের দেখেই এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, কী কথাবার্তা হল বাবু?

মিহির জবাব দিল, কিছু না, তুমি এখন যেতে পারো।

ভজহরিকে বিদায় দিয়ে তারা নিজেদের পথে চলতে লাগল। মিহির বলল, যাক ভালোই হল। এবার আরও বেশি মজা করে বাড়িতে থাকতে পারবে।

মিহির বলল, আর একটা ঘর বাড়ল।

বিজয় অনেকটা হতাশ হয়ে বলল, সে কী? তুমি কি এটাকে মজা মনে করো? এসব ঘর নিয়েই ঝামেলা, তার উপর আর একটা ঘরের উৎপাত!

মিহির বলল, উৎপাত নয় হে, দেখবে লাভই হবে। এ ব্যাপারে। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমার এক বন্ধু আছে সুমন্ত তরফদার-বৈজ্ঞানিক এবং ডিটেকটিভ। ভূত নিয়েও সে গবেষণা করছে। তার সঙ্গে

আজই আমি দেখা করছি। দেখি সে এর একটা সুরাহা করে দিতে পারে কি না।

তরফদারের বিস্ময়

সেদিনই মিহির গেল তরফদারের বাড়িতে। সঙ্গে বিজয়ও গেল। তরফদার তখন বাড়ি ছিলেন না। তিনি কী একটা তদন্তের কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

বাড়ির সামনের দিকেই তাঁর চেম্বার। সেই চেম্বারে মিহির আর বিজয় অনেকক্ষণ বসে রইল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর এলেন সুমন্ত তরফদার।

মিহিরকে দেখে বললেন, কী ব্যাপার মিহির? হঠাৎ আমার খোঁজ পড়ল কেন?

মিহির জবাব দিল, ব্যাপার খুব ভয়ানক। তোমাকেই এর একটা কিনারা করে দিতে হবে।

তরফদার বললেন, ভয়ানক ব্যাপার! কেন, তুমি কি খুন হয়েছ নাকি? হেসে উঠলেন তরফদার।

মিহির বলল, হাসির কথা নয় হে সুমন্ত। খুন কখনও হইনি, কিন্তু খুন হতে আর বিলম্ব নেই।

এবার একটু গভীর হলেন সুমন্ত। বললেন, আমার কাছে যখন এসেছ তখন বুঝেছি একটা কিছু ঘটেছে। ব্যাপারটা কী বলে তো?

মিহির সব ব্যাপারটা খুলে বলতে লাগল। শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যেতে লাগলেন সুমন্ত তরফদার। এ যেন তাঁর পরিচিত ঘটনা। কোথায় যেন তিনি শুনেছেন।

সব কথা শোনা শেষ হওয়ার পর তরফদার জিজ্ঞেস করলেন—এই বাড়িটা কোথায় বলো তো?

মিহির রাস্তার নামটা বলল। তা শুনে প্রায় যেন লাফিয়ে উঠলেন তরফদার। বললেন— এই বাড়ির ঘটনা নিয়ে তো বেশ কয়েকমাস আগে আমার কাছে একজন লোক এসেছিল। আমি তো ঘটনাটাকে খুব বেশি আমলাই দিইনি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—তা হলে বাড়িটা বিখ্যাত ভূতুড়ে বাড়ি তো! অনেকদিন ধরেই এই সব কাণ্ডকারখানা চলছে।

—কিন্তু বাড়িটা ভূতুড়ে না। অন্য কিছু তাতেও সন্দেহ জাগছে। কৌতূহলও হচ্ছে খুব।

—সন্দেহ জাগার কারণ কী ঘটল?

—সে এখন বলব না। তবে ভূতের গবেষণা নিয়ে মেতে ওঠার ব্যাপারে আমার উৎসাহ আরও এতে বেড়ে গেল!

—তবে কি মনে করো ভূতের ব্যাপার ছাড়া অন্য কোনও ব্যাপারও এর সঙ্গে থাকতে পারে?

—এখন কিছু তোমাদের সঠিক করে বলতে পারব না। তবে কত পার্সেন্ট ভূত এই ব্যাপারের সঙ্গে আছে তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

—তা হলে সেই ভারটা তুমি নিচ্ছ?

—হ্যাঁ, নিচ্ছি।

—কবে থেকে?

—কালকে থেকেই নিতে পারি। কিন্তু তার আগে বাড়িটা খালি করে দিতে হবে। তা না হলে আমার কাজের পক্ষে অসুবিধা হবে।

—তা করে দেব। কাল দুপুরের মধ্যেই বাড়িটা খালি করে দেব। তবে কতদিনের মধ্যে এর একটা সুরাহা হয়ে যাবে মনে করো?

তরফদার একটু চিন্তা করে বললেন—তিন-চার দিন তো লাগবেই। তবে একটু এদিকওদিক হলেও হতে পারে।

বেশ, তাই হবে।

সব কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল।

এক দিনের মধ্যেই বাড়িটাতে একটা নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেল। বিজয়ের পরিবারের সকলেই মিহিরের বাড়িতে গিয়ে উঠল।

ওদিকে মিহিরের সেই ডিটেকটিভ বন্ধু সুমন্ত তরফদার তৈরী হলেন ভুতুড়ে বাড়িতে রাত কাটাবার জন্য। বাড়ির সমস্ত চাবি মিহির তাঁকে আগেই দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার একটু পরেই তিনি সেই বাড়িতে চলে এলেন। সঙ্গে তাঁর সাহসী ভৃত্য নিবারণ এবং প্রিয় বুলটেরিয়ার কুকুর-নাম বাঘা। তরফদারের বহুদিনের ইচ্ছা ভুত দেখবেন। ভূত বলে কোনও কিছু আছে কি না তার পরীক্ষা করবেন।

প্রথমে বাড়ির চারদিকটা ঘুরে দেখলেন তরফদার। ঘুরে দেখবার সময় কুকুর বাঘা কী রকম যেন ভাবভঙ্গি করতে লাগল। মনে হল সে কী যেন দেখতে পেয়েছে- কী যেন খুঁজছে এদিকে-ওদিকে। তরফদার তা লক্ষ করে বললেন, কী রে বাঘা, তুই ভূতের গন্ধ পেয়েছিস বলে মনে হচ্ছে!

বাঘা চুপচাপ বসে পড়ে লম্বা জিভটা বের করে মাথাটা এদিক-ওদিক ঘোরাতে লাগল।

বাড়ির বাইরের দিকটা দেখা হয়ে গেল মোটামুটি, এবার তরফদার ভিতরে ঢুকে ঘরগুলি দেখতে লাগলেন। একতলার ঘরগুলি দেখে নিয়ে একটা ঘরের সোফায় বসে সিগারেট ধরলেন। একটু আয়েস করতে করতে ডাকলেন নিবারণকে।

নিবারণ তখন বাইরে দাঁড়িয়ে বুড়ির ঘরের দিকে তাকিয়ে একমনে কী যেন দেখছিল। তরফদারের ডাকে তার হুঁশি হল। সে বলল, আজ্ঞে কর্তা!

—এদিকে এসো।

নিবারণ কাছে এলে তরফদার বললেন, নিবারণ, তুমি দোতলার ঘরগুলো ঘুরে দ্যাখো তো। এই নাও চাবি। বাঘাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।

নিবারণ বাঘাকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। পুরোনো ভাঙা সিঁড়ি, তার ওপর নোংরা। প্রথমে কুকুরই উপরে উঠল, পেছনে পেছনে নিবারণ।

দোতলার ঘরের দরজা খুলতেই ভিতর থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ হঠাৎ তার নাকে এসে ঢুকল। অস্বাভাবিক ভ্যাপসা গন্ধ। যে কুকুরটা এতক্ষণ ঘরে ঢুকবার জন্য হাঁসফাস করছিল, সেও হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর নিবারণ ঘরে ঢুকল। বাঘাও ঢুকল সেই সঙ্গে। নিবারণ সামনের দিকের ঘরটা দেখতে লাগল। একটা তক্তাপোশ ছাড়া ঘরে কোনও আসবাবপত্র নেই।

নিবারণ বেশ কিছুক্ষণ আগে উপরে উঠেছে—এখনও ফিরছে না। তরফদার আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ভাবলেন, উপরে উঠবেন। এমন সময় দেখলেন নিবারণ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, কী হে নিবারণ, তুমি চলে এলে যে?

নিবারণ বলল, বাবুঘরগুলোতে ঢুকলেই গা ছমছম করে। কী অন্ধকার ঘর! আপনার টর্চলাইটটা দিন, নইলে ঘরের জানালা খোলা যাচ্ছে না, ভিতরের ঘরের দরজাটাও খোলা যাচ্ছে না।

এই কথা বলতে না বলতেই দেখা গেল বাঘা সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে ছুটে আসছে। জিভ বের করে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে-হাঁপাচ্ছে ভীষণভাবে।

তরফদার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ কী বাঘা ফিরে আসছে। কেন?

নিবারণ বলল, হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।

বাঘা ছুটে সিঁড়ির নীচে নেমে এল আর কুঁই কুঁই করে শব্দ করতে লাগল। তরফদার লক্ষ করলেন, বাঘা যেন পালিয়ে যেতে চায়। তাই ভাবলেন, ব্যাপার কী? আদর করে মাথা চাপড়াতে বাঘা কিছুটা শান্ত হল! তরফদার বললেন, চলো তো নিবারণ, ওপরটাই একবার ভালো করে দেখি।

তরফদার নিবারণকে নিয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগলেন। বাঘা এবার চলল তাদের পেছনে পেছনে। তার মনে যেন কী রকম ভয় ভয় ভাব।

দোতলার যে ঘরটায় ঢুকতে নিবারণের গা ছমছম করছিল, সেই ঘরটার সামনে এসে দুজন দাঁড়াল। নিবারণ বলল, একটা শব্দ শুনছেন?

—কই? না তো?

তরফদার শব্দ শুনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। তারপর টর্চটা জ্বেলে ভেতরের দিকের ঘরটা খুললেন। মেঝের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখেছ? ভালো করে লক্ষ করো। তুমি কি একটু আগে এই ঘরে ঢুকেছিলে?

নিবারণ বলল, না বাবু, আমি তো এ ঘরটায় ঢুকিনি।

তরফদার বললেন, তা হলে এরকম কেন? মনে হয় একটু আগে কেউ এই ঘরে ঢুকেছিল। কয়েকটি স্পষ্ট পদচিহ্ন।

কার পায়ের ছাপ এগুলো? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, তারপর আর একটা। —মোট পাঁচটা। না, তারপর আর নেই। তারপরেই খাড়া দেওয়াল। ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার তো!

তরফদার বললেন, প্রত্যেকটাই শিশুর পায়ের ছাপ। তাই নয় কি নিবারণ ?

নিবারণ বলল, হ্যাঁ বাবু।

—ভালো করে দ্যাখো তো।

হ্যাঁ, ভালো করেই তো দেখছি।

কোথাও যেতে পারে? কিছুতেই পারে না। তবে?

নিবারণ বলল, ব্যাপারটা তো কিছু বুঝতে পারছি না কর্তা।

তরফদার বললেন, এবার জানালাগুলো খুলে ঘর দুটি ভালো করে দেখা যাক।

নিবারণ জানালাগুলো খুলতে চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ তরফদার দেখলেন বাঘা নেই। তাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বাঘা গেল কোথায়?

নিবারণ বলল, কই, ওকে দেখছি না তো?

ঘরে চেয়ার, টেবিল, আয়না অনেক কিছু আছে। মনে হয় অনেক কাল আগে এগুলো কেউ ব্যবহার করত, এখন আর করে না। তরফদার একটা চোয়ারে বসবার জন্য এগিয়ে গেলেন, কিন্তু ভয়ংকর ধুলো। তাই মনে হয় বহুদিন কেউ এই চেয়ারে বসেনি। বললেন, নিবারণ, চেয়ারটা একটু ঝেড়ে দাও তো, বসব।

নিবারণ চেয়ারের ধুলো ঝাড়বার জন্য এগিয়ে গেল। নিবারণ জানালা খুলতে পারছিল না বলে তরফদার নিজেই গেলেন খুলবার জন্য। অনেকদিন খোলা হয়নি বলে ভয়ানক আঁট হয়ে গিয়েছে। জানালা খুলবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, নিবারণ চেয়ারটা দরজার সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও তো।

কিন্তু নিবারণ চেয়ারখানা নিয়ে যেতে যেতে কেবলই পিছন দিকে ফিরতে লাগল। কেউ যেন তাকে পেছন দিকে ধীরে ধীরে ঠেলছে। তাই সে বলল, কর্তা! আমার পিঠে হাত দিচ্ছে কে?

তরফদার সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। ভেবে পেলেন না, কেন নিবারণ ওরকম কথা বলছে। সেই মুহূর্তেই নিবারণ বেশ চড়া গলায় বলে উঠল, এ কী কর্তা আমাকে চড় মারলে কেন?

তরফদার বলতে গেলেন, চড়! আমি তোমাকে চড় মারব কেন?

কিন্তু তিনি কথাটা বলবার আগেই ওদিকে নিবারণ চেয়ারখানা নিয়ে উলটে পড়ে গেল। মনে হয় কে যেন তাকে ঠেলে ফেলে দিল। নিবারণ কোনও রকমে উঠে নিজেকে সামলে নিয়ে তরফদারকে জিজ্ঞেস করল, আমার পিঠের ওপর আপনি এমন করে এত জোরে ধাক্কা মারলেন কেন কর্তা?

তরফদার অবাক হয়ে জবাব নিলেন, আমি তোমাকে কেন ধাক্কা মারতে যাব? তুমি বিশ্বাস করে আমি ধাক্কা মারিনি।

—আপনি ধাক্কা মারেননি?

—না।

নিবারণ প্রথমে সত্যি বিশ্বাস করেনি। এবার সে বিশ্বাস করল। কিন্তু অবাকও যেমন হল, ভয়ও তেমনি পেল। সে আমতা আমতা করে বলল, তবে কে ধাক্কা মারলে?

এমন সময় বাঘার ঘেউ ঘেউ শব্দ শোনা গেল। তরফদার বললেন, নিবারণ, বাঘা ডাকছে।

নিবারণ ঘর থেকে বেরিয়ে চেঁচিয়ে বলল, বাঘা, বাঘা, এই যে আমরা এখানে।

নিবারণ ভেবেছিল ডাক শুনলেই কুকুরটা তাদের কাছে ছুটে আসবে। কিন্তু তা হল না। বাঘাটা ছুটে পালাতে লাগল। নিবারণ তাকে ধরবার জন্য এগিয়ে গেল তাও পারল না। তার কেমন যেন খটকা লাগল। সে-ও পেছনে পেছনে ছুটতে ছুটতে বলল, কর্তা, আসুন আমরা নীচে উঠোনের দিকে যাই।

তরফদার ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলেন না। তিনিও সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের দিকে যেতে লাগলেন। মুখে বললেন, নিবারণ আমি আসছি।

বাঘা এসে বাড়ির একটা পাঁচিলের কাছে থামল। নিবারণ আগেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল, তরফদারও সেখানে এসে থামলেন। একটা আশ্চর্য ব্যাপার তারা দেখলেন, সেখানেও সেই শিশুর পায়ের ছাপ।

বাঘাটা মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে লাফাবার উদ্যোগ করছিল। নিবারণ আদর করে। বারকয়েক মাথা চাপড়ে দিতেই যেন বাঘা অনেকটা শান্ত হল। আগে বাঘার এরকম অবস্থা কখনও হয়নি।

তরফদার বললেন, নিবারণ, আমরা আজ রাত্রে উপরের ওই ঘরেই রাত কাটাবার ব্যবস্থা করব। তুমি ওই ঘরটা একটু পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করো।

নিবারণ বলল, কোন ঘরে কর্তা? যে ঘরে আমাকে চেয়ার শুদ্ধ ফেলে দিয়েছিল!

তরফদার বললেন, হ্যাঁ।

নিবারণ বলল, সর্বনাশ! ও ঘরে রাত কাটানোর চেয়ে বিষ খাওয়া ভালো। আমি পারব না কর্তা।

তরফদার বললেন, ভয় নেই। আমি তো আছি। বোধহয় কোনও জাদুকর ভোজবাজির খেলা দেখিয়ে আমাদের অবাক করে দিতে চায়। ভেল্কিটা যে কী ধরতে পারছি না বটে, কিন্তু আজ রাত ফুরবার আগেই তাকে আমরা ধরে ফেলবই ফেলব।

রাতের ঘটনা

দুজনেই ক্লান্ত।

এবার শোবার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিছানাপত্র সব সঙ্গেই ছিল। ভিতরের ঘরখানায় ছিল একটি সেকেলে পালঙ্ক। ঝাড়ামোছা করে তার উপর বিছানা পাতা হল। সেখানে হল নিবারণের শোবার ব্যবস্থা। সামনের ঘরে তরফদারের বিছানা করা হল। দুঘরের মাঝখানে একটি দরজা। সেই দরজাটা খুলে দেওয়া হল।

ঘুম ঘুম ভাব থাকলেও ঘুম অবশ্য কারুর চোখেই এল না। কেটে গেল অনেকক্ষণ।

দুজনের মনেই কী রকম যেন একটা অস্বস্তিভাব।

এমন সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

হঠাৎ ঘরের ভেতর আবির্ভূত হল মস্ত একটা বিবর্ণ আলোক। একটা মনুষ্যমূর্তির মতোই কিন্তু গঠনহীন ও অবাস্তব। দুই ঘরের মাঝখানে সেই মূর্তিটা নড়ে-চড়ে উঠল এবং তারপর ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল নীচের দিকে।

তরফদার ডাকলেন, নিবারণ!

নিবারণ সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিল, কর্তা?

উঠে পড়ো।

হ্যাঁ, উঠেছি কর্তা।

কিছু দেখতে পেয়েছ?

হ্যাঁ, দেখেছি।

তরফদার বললেন, ওই জিনিসটাকে লক্ষ্য করে আমাদের চলতে হবে।

ভয়ার্তকণ্ঠে বলল নিবারণ, ওই আলোকটাকে?

তরফদার বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো দেরি করার সময় নেই।

নিবারণ বললে, এই রাত্রিবোলা অন্ধকারের মধ্যে?

তরফদার বললেন, হ্যাঁ, ওই অন্ধকারের মধ্যেই চলতে হবে। টর্চ তে রয়েছে ভয় কী?

দুজনেই এগিয়ে চলল। তরফদারের এক হাতে টর্চ, আর এক হাতে রিভলভার।

নিবারণের হাতে একটি কাঠের ডান্ডা। এই বাড়ির ভেতরেই সে কাঠের ডান্ডাটি খুঁজে পেয়েছিল। তাই লাঠির বদলে ওটাই হয়েছিল তার সম্বল।

ওই বিবর্ণ আলোছায়াটি নীচে গিয়ে প্রবেশ করল একটি ঘরের ভিতরে, তারপর একটি বিছানার উপরে গিয়ে উঠল। ওই আলোছায়াটি ক্রমশ ছোটো হতে লাগল, তারপর একটি ছোটো বিন্দুতে পরিণত হল। এক মুহূর্ত সেখানে স্থির হয়েই কাঁপতে কাঁপতে একেবারে নিভে গেল সেই অদ্ভুত আলোকবিন্দু।

বাঘার কথা এতক্ষণ কারুর মনে ছিল না। তাদের পেছনে পেছনে থেকেও বাঘা কোন ফাকে খাটের তলায় লুকিয়েছিল তা কেউ দেখতে পায়নি। লক্ষ পড়ল। যখন সে বেরিয়ে এল।

এবার বাঘা বাইরে বেরিয়ে চলল। অন্য ঘরের দিকে। তরফদার বললেন, নিবারণ চলো আমরা বাঘার পেছনে পেছনে যাই।

দুজনে তাই করলেন। তাঁরা দেখলেন, একটা বন্ধ ঘরের সামনে এসে বাঘা দাঁড়াল। সেটা বুড়ির ঘর। ঘরটা তালা বন্ধ। বাঘা সেই ঘরে ঢোকবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল।

তরফদার বললেন, এই ঘরটাতে ঢোকবার জন্য বাঘার এত চেষ্টা কেন? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনও রহস্য রয়েছে। তালা ভেঙে ঘরটা খুলতে হবে।

নিবারণ বলল, তালাটা ভাঙতে হয়তো একটু কষ্ট হবে। কিন্তু দরজাটা ভারী পুরানো ওটাকে সহজেই ভাঙা যাবে।

সামনে বড়ো বড়ো ইট ও পাথর পড়ে ছিল। নিবারণ সেগুলির সাহায্যে ঠোকাঠুকি করতেই দরজাটা খুলে গেল। পরপর দুটি ঘর। পেছনের ঘরের দরজাটা খুলতে খুব অসুবিধা হল না। সেই ঘরে ঢুকে বাঘা দেওয়াল-আলমারিটার কাছে গিয়ে তার বন্ধ দরজাটা বারবার আঁচড়াতে লাগল।

ব্যাপার আছে। এর ভেতর। আমাদের তা দেখতে হবে।

আলমারিটার দরজা খুব দামি। কিন্তু বিনা যত্নে ও অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইটের কয়েকটা ঘা মেরে ওটাকে খোলা হল।

আলমারিটা খুলে পাওয়া গেল পুরোনো বিবর্ণ একটা রুমাল। আর একটা খোপে রয়েছে মেয়েদের ব্যবহার্য কিছু পোশাক-পরিচ্ছদের অংশ এবং বিবর্ণ হলদে ফিতে দিয়ে বাঁধা দুখানা খামে ভরা চিঠি।

তরফদারের কৌতূহল তাতে উগ্র হয়ে উঠল। চিঠি দু-খানা তিনি হাতে নিলেন। হঠাৎ যেন মনে হল কারও পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু অদৃশ্য লোকের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। খুব

জোর নয়, অস্পষ্ট। নিবারণের মনে ভয় জাগল, তরফদারের মনে জাগল কৌতূহল।

নিবারণ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চিঠি দু-খানা রয়েছে তরফদারের হাতে। তিনি ঘর থেকে বাইরে পা দিতেই বাঘা ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

তরফদার বললেন, কী রে বাঘা, তোর আবার কী হল?

কিন্তু বলতে না বলতেই এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। কে যেন তরফদারের কবজি চেপে ধরে তার হাত থেকে চিঠি দু-খানা কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে। অবশ্য সেই হাতের স্পর্শ খুব কঠিন নয়। তরফদার আরও জোর করে চিঠি দু-খানা চেপে ধরলেন। বাঘা ঘেউ ঘেউ করে উঠল আরও জোরে। তারপর আর সেই অশরীরী আত্মার কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

আবার তরফদার নিজের নির্দিষ্ট ঘরে দোতলায় ফিরে গেলেন। যাবার আগে নীচতলার ঘরে একটি টেবিল ল্যাম্প দেখতে পেয়ে নিবারণকে বললেন, নিবারণ, এই টেবিল ল্যাম্পটা উপরে নিয়ে এসো তো।

নিবারণ টেবিল ল্যাম্পটা হাতে তুলে নিল। দোতলায় গিয়ে তরফদার বললেন, নিবারণ, ল্যাম্পটা জ্বালাও।

নিবারণ ল্যাম্পটা জ্বালালে তরফদার টেবিলের উপর চিঠি দুটি রাখলেন, রিভলবারটা রাখলেন তার পাশে। বসে একটু সুস্থির হয়ে বললেন, নিবারণ, তুমি কুকুরটার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও, ওটা যেন এক কোণে বসে ঠকঠক করে কাঁপছে।

নিবারণ কুকুরটার দিকে এগিয়ে গেল। তরফদারের মন রয়েছে চিঠি দু-খানির দিকে। একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলের ধারে বসে একমনে চিঠি পড়তে লাগলেন।

চিঠি দু-খানিতে খুব বেশি কথা লেখা নেই। তারিখ দেখে বোঝা গেল ঠিক ছত্রিশ বছর আগেকার লেখা। স্ত্রীকে সম্বোধন করে চিঠি দু-খানা লিখছে কোনও ভদ্রলোক। লেখার ধরন দেখলেই বোঝা যায়, পত্রলেখক রীতিমতো শিক্ষিত। কিন্তু জায়গায় জায়গায় কথাগুলো অস্পষ্ট। তাতে পাওয়া যায় যেন কোনও গুপ্ত অপরাধের ইঙ্গিত। ইঙ্গিতগুলিও রহস্যপূর্ণ।

(১) খুব সাবধান, জানাজানি হয়ে গেলে সবাই আমাদের অভিশাপ দেবে।

(২) রাত্রে ঘরের ভেতর আর কোনও লোক নিয়ে শুয়ো না। তোমার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলার বদ অভ্যাস আছে।

(৩) যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। আমাদের ভয় কী, আমাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। মরা মানুষ আর বাঁচে না।

—এইখানে মেয়েলি হাতে ব্র্যাকেটের ভেতর লেখা (হ্যাঁ, মরাও আবার বেঁচে ওঠে)। অদ্ভুত হেঁয়ালিপূর্ণ চিঠি। অথচ অনেক রহস্য, অনেক চক্রান্ত যেন লুকিয়ে রয়েছে লেখাগুলির ভেতর।

চিঠি দু-খানা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে তরফদার মনে মনে কথাগুলির মর্মার্থ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

তখন রাত হয়েছে অনেক। চারিদিক নিস্তব্ধ। চিঠি দু-খানা টেবিলের উপর রেখে তরফদার টেবিল ল্যাম্পটা একটু ডিম করে দিলেন। নিবারণকে

বললেন, নিবারণ, তুমি সামনের ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে মাঝখানের দরজা খোলাই থাক।

শুয়ে শুয়েও তরফদার চিঠির বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। ঘুম যেন চোখ থেকে বিদায় নিয়েছে। কুকুরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছে খাটের তলায়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটতে লাগল। রাত তখন ক-টা কে জানে? হঠাৎ মনে হল, সাঁ করে যেন একটা দমকা কনকনে হাওয়া গায়ের উপর দিয়ে বয়ে গেল। খট করে যেন শব্দ হল একটা ।

চমকে উঠলেন তরফদার। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল নাকি? তরফদার মাথা তুলে দেখলেন— না, যেমন খোলা ছিল তেমনি খোলাই আছে।

টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন বাতিটা তেমনি নিবু নিবুভাবে জ্বলছে। কোথাও কেউ নেই। অথচ কী আশ্চর্য, টেবিলের উপর থেকে হাতঘড়িটা ধীরে ধীরে সরে গিয়ে, একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সর্বনাশ, এবার রিভলভারটা উধাও হবে না তো? তরফদার বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন। চট করে টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলেন রিভলভারটা।

ঠিক সেই সময়ে দুটি ঘরের মাঝখানে কীসের যেন একটা শব্দ হল। যেন মেঝের উপর কিছু ঠোকার শব্দ হল। ঠিক-ঠক-ঠক। ঠিক-ঠক-ঠক, ঠিক-ঠক-ঠক।

পর পর তিনবার। পাশের ঘর থেকে নিবারণ জিজ্ঞেস করল, ও শব্দ কি আপনিই করছেন কর্তা?

তরফদার জবাব দিলেন, না, আমি করছি না।

—তবে কে এমন শব্দ করলে?

তরফদার ভাবলেন, ঘরে কেউ ঢোকেনি তো? তিনি নিবু নিবু। বাতিটা বাড়িয়ে দিতে গেলেন। কিন্তু হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি যেন তাঁর গায়ে লাগল। বাড়াতে গিয়ে উলটে বাতিটা কমে গিয়ে একেবারে নিভেই গেল।

টার্চলাইটটা খুঁজতে লাগলেন এবার। অন্ধকারে টেবিলের উপর হাতড়িয়ে তবে সেটা খুঁজে পেলেন। টর্চের আলো ফেললেন ঘরের মেঝের উপর এদিকে-ওদিকে।

কই, কোনও লোক নেই তো?

দেখা গেল কুকুরটা জেগে উঠে মেজের উপর চলে এসেছে। তার সর্বাঙ্গের লোম যেন খাড়া হয়ে হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টিও তেমনি হিংস্র।

তরফদার বললেন, কী রে বাঘা, তোর হল কী? এমন করছিস কেন?

বাঘা কিছু না বলে শুধু এদিক-ওদিক মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। তরফদার টর্চের আলোতে দেখলেন, ঘরের দরজা তেমনি ভেতর থেকে বন্ধ আছে। ঘরে কেউ ঢুকলে দরজা খোলা থাকত।

বাঘা কুকুরটাও ঘরের মাঝখানে তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ঘেউ ঘেউ করছে না, ছোটাছুটিও করছে না। তার দৃষ্টিটা যেন বার বার গিয়ে পড়ছে। ঘরের জানালাটার দিকে জানালাটা খোলা।

কিন্তু কোনও লোক কি ওই জানালা দিয়ে ঢুকতে পারে? কী করে ঢুকবে?

নিবারণ জেগে বিছানার উপর চুপচাপ বসেছিল। সে এবার সন্তর্পণে এগিয়ে এল। বলল, কর্তা, দেশলাইটা কোথায়?

তরফদার পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে দিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও নিবারণ টেবিল ল্যাম্পটা জুলিতে পারল না। দেশলাইয়ের কাঠিটা জুলেই নিভে যায়। হঠাৎ যেন কোনদিক দিয়ে ছুটে আসে দমকা হাওয়া।

তরফদার এগিয়ে যেতে লাগলেন জানালার দিকে। নিবারণের সঙ্গে তার গায়ের ধাক্কা লাগল। তাতে ঘটে গেল আর এক বিভ্রাট। নিবারণ সেই সময়ে টেবিল ল্যাম্পের চিমনিট সামলাতে গিয়েছিল, হঠাৎ হাত লেগে চিমনিটা ভেঙে গেল।

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, কী হল?

নিবারণ জবাব দিল, চিমনিটা ভেঙে গেল কর্তা।

—যাক, তা হলে আর জ্বালাতে হবে না।

হঠাৎ নিবারণের যেন কী হল। সে অন্ধকারের মধ্যেই খুলে ফেলল ঘরের দরজাটা তারপর বলল, 'কর্তা, পালান, পালান। আমাকে সে ধরতে আসছে।' বলে মুহূর্তের মধ্যে সে বাইরে চলে গেল।

কিন্তু সে তরফদারের কথা শুনল না। বেগে সিঁড়ি দিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। শোনা গেল বাইরের সদর দরজা খোলার শব্দ। তারপর সব চুপচাপ।

ভূতুড়ে বাড়িতে তরফদার একা। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি, নিবারণ ভিতু মানুষ হয়েও কেমন করে একা বাইরে চলে গেল? তা হলে কি বাড়ির ভিতরের ভয়টা বাইরের ভয়ের চেয়েও বেশি?

এখন এই নির্জন বাড়িতে বাঘা কুকুরটা ছাড়া তার আর কোনও সঙ্গী নেই।

কিন্তু এ কী! কুকুরটা কী রকম শব্দ করছে যেন! ঘরের ভিতর আবার সেই ঠক ঠক শব্দ।

তরফদার টর্চের আলোটা বাঘার উপরে ফেললেন। এ কী দেখছেন তিনি ? দুঃস্বপ্ন নয় তো?

একটা ছায়ামূর্তি কুকুরটাকে গলা টিপে ধরেছে। তার হাত দুটোই শুধু একটু একটু বোঝা যাচ্ছে যেন—মূর্তিটাকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না।

কুকুরটা বাঁচবার জন্য ছটফট করছে। অথচ চিৎকার করার উপায় নেই। মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে এক অস্বাভাবিক শব্দ।

তরফদার আর সহ্য করতে পারলেন না। ওই ছায়ামূর্তিটাকে লক্ষ্য করে রিভলভারের গুলি ছুঁড়লেন।

গ্রুম!

হঠাৎ যেন ঘরের ভেতর একটা তোলপাড় হল। কী হল তিনি নিজেও বুঝতে পারলেন না।

ছায়ামূর্তিটা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে নানাদিকে। তাঁর উপরও বুঝি এসে পড়বে। কোনও বুদ্ধি ঠিক করতে না পেরে তরফদার আবার রিভলভারের গুলি ছুঁড়লেন।

গ্রুম—গ্রুম—

এবার তার লক্ষ্য হয়তো স্থির ছিল না, তাই একটা গুলি লাগল বাঘার গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তির গায়েও হয়তো লাগল।

বাঘা রক্তাক্ত দেহে ছিটকে পড়ল মেঝের উপর। এবার তরফদার বাঘার গায়ের উপর টর্চের আলো ফেলে দেখলেন, বাঘা নির্জীব হয়ে পড়ে আছে, তার দেহে প্রাণ নেই।

কিন্তু সেজন্য দুঃখ করার সময় এখন নেই। এবার ছায়ামূর্তির সঙ্গে লড়াই করতে হবে। সেজন্য প্রস্তুত হলেন তরফদার। আজ তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এসপার-ওসপার একটা কিছু করতেই হবে।

কিন্তু কোথায় ছায়ামূর্তি? সারা ঘরটা যেন ধোঁয়ার মতো কী একটা জিনিসে ভরে উঠতে লাগল। তরফদার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এভাবে কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। এবার টেবিলের ধারে এসে চেয়ারের উপর বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর লক্ষ করলেন ঘরের ভেতর যেন জানালা দিয়ে একটু একটু চাঁদের আলো ঢুকছে। আজ কী তিথি তা তিনি জানেন না। তবু বুঝলেন, আকাশে চাঁদ উঠছে।

এবার চোখের সামনে যা দেখলেন তা অতি আশ্চর্য। ঘরের ভেতর থেকেই আত্মপ্রকাশ করছে একটা বিরাট অন্ধকার। কিন্তু ওটা কী? ক্রমে ক্রমে ওটা বেশি কালো হয়ে উঠছে। কী বীভৎস। কী ভয়ংকর! ওই অন্ধকার মূর্তির নিম্নার্ধ আছে কক্ষতলে, কিন্তু উপরার্ধ প্রায় স্পর্শ করছে ছাদের কড়িকাঠ।

তরফদার চেয়ার ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। যেন মহাভার কোনও শক্তি তাকে চেপে আছে। আর খুব উঁচু থেকে তাকে যেন লক্ষ করছে ভাটার মতো দুটো চক্ষু।

হঠাৎ তরফদারের মনে পড়ল টেবিলের উপর চিঠি দুটা রয়েছে। সেই চিঠি দুটো হস্তগত করা দরকার। তাই এবার টর্চের আলো ফেললেন টেবিলের উপর।

ওই তো, চিঠি দুটো টেবিলের উপর রয়েছে। তরফদার তা নেবার জন্য হাত বাড়ালেন। কিন্তু পারলেন না। কে যেন হাত বাড়িয়ে চিঠি দুটো তুলে নিল।

ছায়ার মতো দুটো হাত। দুহাতে দুটি চিঠি চোখের পলকে তুলে নিয়ে গেল অদৃশ্য কোনও মানুষ। লোকটিকে বাইরে যেতে দেখলেন না, কিন্তু চিঠি দুটিও আর দেখা গেল না। একটু পরেই আবার শোনা গেল সেই শব্দ ঠিক-ঠক-ঠক, ঠিক-ঠক-ঠক। কী আশ্চর্য। শব্দ লক্ষ্য করে তরফদার সেদিকে টর্চের আলো ফেললেন। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। এমন সময় পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়ির দিকে। তরফদার ভাবলেন, বুঝি নিবারণ ফিরে এল। তার মনে সাহস ফিরে এল একটু। তিনি ডাকলেন, নিবারণ! নিবারণ!

কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। নিবারণ এলে নিশ্চয়ই সাড়া দিত। তা হলে? তার কী হল? কার পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়ির উপর। কোনও লোক এলে নিশ্চয়ই তার দেখা পাওয়া যেত! তরফদার ভাবলেন, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখবেন কেউ আসছে কি না। কিন্তু একটু নড়বার শক্তিও যেন তার নেই।

কী এক অজানা ভয়, অদৃশ্য শক্তি আর প্রবল অনিচ্ছা তাকে পাষাণের মতো নিথর করে দিয়েছে।

ভয়ানক দমে গেলেন তরফদার। তার সঙ্গী ছিল দুজন, এই সংকট সময়ে একজনও কাছে নেই। একজন মৃত্যু-একজন অতি আশ্চর্য ভাবে উধাও।

নিবারণকে সাহসী বলেই তরফদার জানতেন। কিন্তু এমনভাবে সে চলে গেল, সেটা খুবই দুঃখের ব্যাপার।

রহস্যজনকও বটে। প্রভুকে এমনভাবে একলা ফেলে পালিয়ে যাবার মানুষ তো সে নয়। তা হলে? তার কী হল? অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে কেমন যেন হয়ে গেলেন তরফদার। এমন সময় একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল।

বিভীষিকা

তরফদার যেখানে বসেছিলেন তার কাছাকাছি আর একটা খালি চেয়ার ছিল। সেই চেয়ারটা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল। দৃশ্যমান কেউ তাকে নিয়ে গেল না, কিন্তু সে নিজে নিজেই হীড়হড় শব্দে এগিয়ে টেবিলের ওপাশে গিয়ে নিতান্ত জড়ের মতোই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ সেই চেয়ারের উপর মূর্তিধারণ করল এক নারী। জীবন্ত আকৃতি নয়, মৃত্যুবৎ পাংশুবর্ণ। কিন্তু সে তাকিয়ে আছে। দরজার দিকে।

কী তার উদ্দেশ্য কে জানে?

সে কি কাউকে দেখতে চায়?

এমন সময় আবার যা ঘটল তা আরও অদ্ভুত।

দরজার সামনেই আবির্ভূত হল এক পুরুষ মূর্তি। যুবক। কিন্তু মরার মতো পাংশুবর্ণ। ছায়ার উপরার্ধে জ্বলে জ্বলে উঠছে দুটো চক্ষু এবং তার দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে সোফায় বসা সেই নারীমূর্তির দিকে।

তরফদার দেখলেন, ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কে দরজা বন্ধ করছে তা বোঝা গেল না। নারীমূর্তিটিও ঠিক সেই সময়ে কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল।

তরফদার বন্ধ দরজার উপর টর্চের আলো ফেললেন। দেখলেন, দরজাটা আঁটসাঁট ভাবে বন্ধ। কেউ যেন ভিতর থেকে ঠেলে অথবা বাইরে থেকে টেনে বন্ধ করে দিয়েছে।

কে সে? কোথায় সে লোক?

আর সহ্য করতে পারলেন না তরফদার। একটা জীবন্ত মানুষের পক্ষে এ ব্যাপার সহ্য করা একেবারেই অসম্ভব। সমস্ত গা তার ছমছম করছে। চিৎকার করে তিনি বললেন, কে দরজা বন্ধ করছ? তাড়াতাড়ি খোলো দরজা।

কিন্তু দরজা খুলল না।

পুরুষমূর্তি পায়ে পায়ে এগিয়ে এল নারীমূর্তির দিকে। নারীমূর্তি চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল। সে যেন ভয় পেয়েছে। পুরুষটির হাতে দেখা গেল একটি ছোরা। সেই ছোরা নিয়ে সে আক্রমণ করতে গেল মেয়েটিকে। মেয়েটি চমকে গিয়ে চিৎকার করে উঠল।

মুখের ভঙ্গিতে বোঝা গেল সে চিৎকার করছে। কিন্তু সেই চিৎকারের শব্দ শোনা গেল না। এ যেন নির্বাক চলন্ত ছায়াচিত্র। লোকটি ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটির উপরে। ছোরা দিয়ে তাকে আঘাত করল। ধস্তাধস্তি শুরু হল দুজনের মধ্যে।

তরফদার কী করবেন, কিছু স্থির করতে পারলেন না। গুলি করবেন কি? কিন্তু পরীক্ষণেই ভাবলেন, তার পরিণাম কী হবে কে জানে? তার নিজের কী সম্পর্ক আছে। এই ঘটনার সঙ্গে? কাজেই যতক্ষণ নিজের উপর কোনও আঘাত না আসবে ততক্ষণ নীরব দর্শক হয়ে থাকাই উচিত; কিন্তু যা অবস্থা ঘটছে তা খুবই ভয়াবহ। হয়তো পুরুষটি নারীটিকে খুন করেই ফেলবে।

নারীর কপাল দিয়ে রক্তের ধারা বইছে। সে আর আঘাত সহ্য করতে পারছে না। এবার সে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল।

এমন সময় দেখা গেল সেই কালো ছায়ামূর্তিটা এগিয়ে আসছে সেদিকে। সেই ছায়ামূর্তিটা বুঝি একটা বাধা সৃষ্টি করার জন্যই তাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

অকস্মাৎ তাদের প্রত্যেকেই ঢাকা পড়ে গেল নিবিড় এক অন্ধকারের ঘেরাটোপের মধ্যে। তারপর জুলে উঠল আবার একটা বিবর্ণ আলো এবং দেখা গেল দুই ভূতুড়ে নর-নারী মূর্তি যেন সেই অতিকায় ছায়ামূর্তির কবলগত।

আবার জ্বলে জ্বলে উঠল ছোট্ট ছোট্ট আলোর ফানুসগুলো! আবার তারা ব্যস্তভাবে আনাগোনা ও ছুটোছুটি করতে লাগল। এদিক-ওদিক, উপরে-নীচে সর্বত্র। তারা হয়ে উঠল। আরও বেশি পুঞ্জীভূত, তাদের গতি যেন আরও বেশি বন্য ও দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা।

সুমন্ত তরফদার বুঝতে পারলেন না। কী ব্যাপার ঘটছে। সব যেন এলোমেলো-বীভৎস-ভয়ংকর! ছায়াছবির মতো যেন ব্যাপার ঘটছে। মূর্তি ধারণ করল এক বৃদ্ধ নারী—আর দেখা গেল টেবিলের উপর থেকে যা অদৃশ্য হয়েছিল, সেই চিঠি দু-খানা তার হাতে রয়েছে। তার পরেই নারীমূর্তির পায়ের তলায় মেঝের উপরে আর এক দৃশ্য জেগে উঠল। একটা ছন্নছাড়া অপরিচ্ছন্ন শিশুমূর্তি হুমড়ি খেয়ে রয়েছে।—তার মুখে-চোখে কেমন এক আতঙ্কের আভাস। তরফদার নিস্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখলেন, বৃদ্ধার মুখের উপর থেকে ধীরে ধীরে জরার চিহ্ন মুছে গিয়ে যৌবনের লালিত্য ফুটে উঠেছে। তারপর এগিয়ে এল সেই কালো ছায়া, তার নিরেট কালিমার মধ্যে সবকিছু অবলুপ্ত হয়ে গেল।

ঘরের ভেতর তখন শুধু ক্ষুদ্র লৌকিক জীব সুমন্ত তরফদার, আর সেই বিপুল অলৌকিক ছায়ামূর্তি। আবার দেখা দিল কেউটের মতো দুটো উৎকট চক্ষু। আলোর বুদবুদগুলো আবার

অনিয়মিত, এলোমেলো গতিতে উঠছে, নামছে, ছুটাছুটি করছে, ঘরের ভেতর এসে পড়া চন্দ্রকিরণের সঙ্গে করছে মেলামেশা।.

ঘরের অন্ধকার সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, কালো ছায়াও হয়ে আসছে ক্ষীণ, ক্রমেই ক্ষীণ।

ততই উজ্জ্বলতর।

ঘরের এক জায়গায় কুকুরটা স্থির হয়ে শুয়ে আছে। তরফদার তাকে ডাকলেন। সে জাগল না, নড়লও না। সে মরে কাঠ হয়ে গিয়েছে। তার চোখ দুটো বেরিয়ে পড়েছে কোটরের ভিতর থেকে। জিভখানাও মুখের বাইরে ঝুলছে।

আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার। তরফদার তার ঘড়িটাও আবার টেবিলের উপরেই দেখতে পেলেন। কিন্তু ঘড়ির কীট বন্ধ হয়ে গিয়েছে, চলছে না।

সত্যি, এ এক অসহনীয় ব্যাপার! এই অবস্থার মধ্যেও তরফদার নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন। সেখানেই সূর্যোদয় পর্যন্ত রইলেন। কিন্তু বাকি রাতটুকুর মধ্যে আর কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবু দিনের আলোতেও বুকের মধ্যে অনুভব করলেন কেমন বিষম আতঙ্কের শিহরন! ...তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। আবার কালকের মতো শুনতে পেলেন তার আগে কার্য যেন ১ভয়।

তারপর নীচে এসে যখন দরজা খুললেন, তখন স্পষ্ট শুনতে পেলেন, তার পেছন থেকে নিম্নকণ্ঠে কে হেসে উঠল। কিন্তু পেছনে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলেন না।

নিবারণ নিরুদ্দেশ

বাড়িতে ফিরে তরফদার ভেবেছিলেন নিবারণের দেখা পাবেন। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি।

কিছুক্ষণ পরেই তরফদার রমেনবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। বললেন, আমার কৌতূহল তৃপ্ত হয়েছে। কালকের রাত্রের কথা শুনতে চান?

রমেনবাবু বললেন, ও রকম কথা অনেক শুনেছি, আর শোনবার আগ্রহ নেই। আমি শুধু জানতে চাই, আপনি এই ভূতুড়ে সমস্যার সমাধান করতে পেরেছেন কি না?

আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আপনাকেও একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি 'হিপিনেটিজম' বা সম্মোহন বিদ্যার কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন?

হ্যাঁ।

জানেন তো, সম্মোহিত ব্যক্তি সম্মোহনকারীর প্রভাবে পড়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই নানা কাজ করে। সম্মোহনকারী ঘটনাস্থানে উপস্থিত না থাকলেও বিদ্যমান থাকে তার সম্মোহনের প্রভাব। সে দূর থেকেই যা দেখতে চায়-তা যত উদ্ভট বা আশ্চর্য্যই হোক না কেনসম্মোহিত ব্যক্তি দেখে সেইসব বস্তু বা দৃশ্য।

এই রকম সব কথা শুনেছি বটে। কিন্তু সম্মোহন বিদ্যার সঙ্গে বাড়ির ভৌতিক ঘটনাগুলোর সম্পর্ক কী?

বলছি। আপনি প্রেততত্ত্ববিদদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন?

না।

তাদের কার্যকলাপের কথা শুনেছেন?

শুনেছি।

কী শুনেছেন?

শুনেছি তারা নাকি ভূতের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের ছায়াটাকে টেনে এনে অনেক কাণ্ডকারখানা করেন।

সেই কাণ্ডকারখানা দেখেছেন কখনও?

না।

সে সম্বন্ধে কিছু শুনতে চান?

বলুন।

তারা টেবিল-চেয়ার সচল করেন, শরীরী প্রেতও নাকি দেখান। ভারতের এক শ্রেণির জাদুকরের কীর্তি পৃথিবী বিখ্যাত। তাদের খেলার নাম রোপট্রিক বা দড়ির ফাঁসি। জাদুকরের একগাছা মোটা দড়ি সোজা লাঠির মতো শূন্যে বহু উর্ধ্বে উঠে গিয়ে স্থির হয়ে থাকে। তারপর একটা ছেলে সেই দড়ি অবলম্বন করে উপরে উঠে সকলের চোখের আড়ালে কোথায় মিলিয়ে যায়। তারপর নাকি শূন্য থেকে ঝুপ-ঝুপ করে নীচে এসে পড়ে ছেলেটার খণ্ড খণ্ড দেহ। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। জাদুকর আবার দেহের অংশগুলো জুড়ে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে তোলে।

আপনার বক্তব্য কী, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এসব বলার অর্থ কী?

রমেনবাবু, আমার মতে ওই সব ব্যাপারের প্রত্যেকটির মধ্যে কাজ করে সম্মোহন। আমার সৃষ্ট মোহিনীশক্তির গণ্ডির ভিতরে যে এসে পড়বে, তাকে আমি যা দেখাব, সে তাই দেখবে, আমি যা শোনাব, সে তাই শুনবে।

তারা হবে। আমার মস্তিষ্ক বা ইচ্ছাশক্তির দাসআমার প্রভাবে সকল রকম অসম্ভবই তাদের কাছে হবে সম্ভবপর। এসব কি আপনি বিশ্বাস করেন?

বেশ। আমি তর্ক করতে চাই না। বলুন, তারপর আপনি কী বলতে চান?

রমেনবাবু, আমার বিশ্বাস আপনাদের ওই বাড়ির ভিতরে ওই রকমের কোনও মস্তিষ্কের প্রবল ইচ্ছাশক্তি কাজ করে। সে কে বা তার কার্যপদ্ধতি কী আমি তা জানি না। হয়তো আজ সে জীবিত নেই, কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব। তবু লুপ্ত হয়নি। সেই শক্তিই অদৃশ্যভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আপনার কথা শুনে খুবই বিস্ময় বোধ হচ্ছে। এখন আপনার শেষ বক্তব্য কী বলুন।

তরফদার বললেন, আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন। তবে আমার মনে হয়। ওই বাড়িটাকে আমি ভূতের উপদ্রব থেকে মুক্ত করতে পারব।

রমেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী আমাকে করতে হবে তাই আমাকে বলুন?

তরফদার বললেন, "আপনাকে সঙ্গে করে আমি ওই বাড়িটা একটু ঘুরে দেখতে চাই।

রমেনবাবু বললেন, বেশ তাই হবে। অসুবিধা কী আছে, কবে যাবেন বলুন?

তরফদার বললেন, আমার সহকারী নিবারণ এখনও বাড়ি ফেরেনি, তার জন্য চিন্তায় আছি। তাকে আজ খোঁজ করতে হবে। কাল সকালে চলুন।

বেশ, তাই হবে। আমি কাল সকাল আটটায় ওই বাড়ির সামনে থাকব। আপনি যাবেন।

কথাবার্তা ঠিক করে তরফদার বাড়ি ফিরে দেখলেন নিবারণ ফেরেনি। তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, কোথায় গেল নিবারণ? কোথায় সে যেতে পারে?

কিন্তু সেজন্য বসে থাকলে চলবে না। কর্তব্য তাকে করতেই হবে।

পরদিন আটটার সময় তরফদার সেই বাড়ির সামনে গিয়ে দেখলেন, রমেনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। ঘুরে ঘুরে তঁরা গোটা বাড়িটা দেখলেন নীচতলার শেষ ঘরটার সংলগ্ন একটি ছোটো ঘর দেখে তরফদারের কেমন যেন সন্দেহ হল। এই ঘরটাতে কিছু নেই। হয়তো কয়লা ঘুটে বা অন্য কিছু জিনিস রাখবার জন্যই তৈরি করা হয়েছিল। এখন সেখানে কয়েকটি পাথর পড়ে আছে। তরফদার একটু নেড়েচেড়ে দেখলেন, সেগুলো যেন সিঁদুরমাখা।

অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন তরফদার। রমেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী ভাবছেন?

তরফদার বললেন, আমার মনে হয় যত উপদ্রব আর অমঙ্গলের মূল আছে এই ঘরেই। যদি আমার কথা শোনেন, তবে ওই ঘরটা ভেঙে ফেলতে হবে।

রমেনবাবু বললেন, বেশ ভেঙে ফেলব।

তরফদার বললেন, এই বাড়ি যে বুড়ির জিম্মায় ছিল, বোধহয় তাকেই লেখা দু-খানা চিঠি আমি দেখেছি। খুব সন্দেহজনক চিঠি। চিঠি দু-খানা টেবিলের দেরাজে রেখে দিয়েছি। আপনিও পড়ে দেখতে পারেন। তারপর যদি ইচ্ছা করেন, বুড়ির পূর্বজীবন সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবেন।

রমেনবাবু চিঠি দু-খানি পকেটে পুরলেন। তারপর বললেন, বেশ, খোঁজখবর নেব। যথাসময়েই সব খবর পাবেন।

দুজনেই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

কয়েকদিন পর তরফদার রমেনবাবুর কাছ থেকে একটি পত্র পেলেন। তাতে লেখা—

প্রিয় মহাশয়,

আপনার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার দু-দিন পরেই আমি সেই হানাবাড়িতে গিয়েছিলাম। ভজহরিকে সঙ্গে নিয়ে নানারকম খোঁজখবর সংগ্রহ করেছি। বৃদ্ধাকে লেখা চিঠি দু-খানি আমি পাঠ করেছি এবং পাঠ করে বিস্মিত হয়েছি। কোনও অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। তবে খোঁজখবর নিয়ে যা জানতে পেরেছি তা হচ্ছে এই:

বৃদ্ধার নাম সৌদামিনী। সে সম্পন্ন গৃহস্থের মেয়ে। আগে সহোদর অনন্তলালের কাছেই থাকত। অনন্তলাল বিপত্নীক, ছয় বৎসরের একটি পুত্রের পিতা। সেই ছেলেটির লালনপালনের ভার ছিল সৌদামিনীর ওপরে।

ছত্রিশ-সায়ত্রিশ বৎসর আগে সৌদামিনী তার ভাই অনন্তলালের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন একটি লোককে বিবাহ করেছিল, প্রথম জীবনে সে নাকি ছিল ডাকত। বিবাহের ঠিক এক মাস পরেই অনন্তলাল হাওড়া পুলের তলায় জলে ডুবে মারা যায়। কিন্তু লাশ পাওয়া যাবার পর দেখা যায়, তার

গলায় রয়েছে আঙুলের দাগ-যেন কেউ গলা টিপে তাকে হত্যা করেছে। কী কারণে জানি না, ব্যাপারটা নিয়ে পুলিশ প্রথমে মাথা ঘামালেও পরে সব কিছু চাপা পড়ে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক। ভ্রাতুষ্পপুত্রের অভিভাবিকা হয় সৌদামিনীই। কিন্তু পিতার মৃত্যুর ছয় মাস পরেই শিশুপুত্রটিও মারা পড়ে। সেই মৃত্যুর কারণও দৈব দুর্ঘটনা। শিশু নাকি কেমন করে দোতলা থেকে একতলার উঠানের উপরে পড়ে যায়। কেউ কেউ মনে করে এর পেছনে কোনও ষড়যন্ত্র আছে। এরপর স্বাভাবিকভাবেই পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় সৌদামিনী।

কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! বিবাহের পর বৎসর ঘুরতে না ঘুরতেই তার স্বামী নিরুদ্দেশ হয়। তারপর আর সে ফিরে আসেনি। কানাঘুষায় শোনা যায়, বিদেশে কোথায় ডাকাতি করতে গিয়ে সে মারা পড়েছে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলেও সৌদামিনীর অর্থের অভাব রইল না। তবে সে সুখও হল অল্পকালের জন্য স্থায়ী। হঠাৎ একটি বড়ো ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বেলে তার আর্থিক সৌভাগ্যকে ব্যর্থ করে দিল। তখন সে এক ধনী লোকের কাছে বাড়ি বিক্রি করে দেয়। সেই বড়োলোক সৌদামিনীকে তার জীবিতকাল পর্যন্ত বাড়িতে বাস করবার অনুমতি দেন। এই হল সংক্ষেপে সৌদামিনীর ইতিহাস। আমি সেই বাড়ির মালিকেরই নিযুক্ত করা লোক।

এবার এদিকের কথা শুনুন। আপনি যে ছোটো ঘরখানা ভেঙে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন, সে ঘরে আমি অনেকক্ষণ ছিলাম। অবশ্য সেখানে আমি কিছু দেখিনি, কোন শব্দও শুনিনি, কিন্তু কেন জানি না।

সারাক্ষণই আমার মনের ভিতরে জেগে উঠেছিল এক প্রবল আতঙ্ক । মেঝে ভেদ করে যেন কেমন একটা বিষাক্ত ভাপ বাইরে বেরিয়ে আসছিল। সর্বাঙ্গ আমার শিউরে উঠছিল।

আমি আপনার পরামর্শ মতোই কাজ করব। জনকয় মজুর ঠিক করেছি, তারা আসছে, রবিবার সকালেই ওই ঘরখানা ভেঙে ফেলতে শুরু করবে। সেই সময়ে আপনি উপস্থিত থাকলে অত্যন্ত আনন্দিত হব। ইতি—

রমেন্দ্রনাথ রায়

ঘটনার রসহ্যজাল

চিঠি পড়ে তরফদার আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। বৃদ্ধ সৌদামিনীর জীবনের রহস্য যে কী তা যেন ক্রমেই তার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠতে লাগল।

দুর্বোধ্য হয়তো থেকেই যেত যদি না হঠাৎ সেই বাড়ির মালিক বেড়াতে এসে দু-দিনের জন্য কলকাতায় এসে না উঠতেন।

আর দৈবচক্রেই বাড়িওয়ালা পরিতোষ চৌধুরির সঙ্গে তরফদারের দেখা হয়ে গেল। পরিতোষবাবু বৃদ্ধার মৃত্যুসংবাদ রমেনবাবুর কাছে শুনেই কী মনে করে বাড়িটি দেখতে এলেন। সেই সময়ে তরফদারও। সেই বাড়িতে ছিলেন।

তরফদার পরিতোষ চৌধুরির সঙ্গে আলাপ করে সব ঘটনা খুলে বললেন। রমেনবাবু কিন্তু চাইছিলেন তরফদার যেন খুঁটিনাটি সব ঘটনা বাড়িওয়ালার কাছে না বলে। কারণ তাতে তার স্বার্থহানি ঘটতে পারে।

বাড়ির ব্যাপারে রমেনবাবুর কী গোপন স্বার্থ আছে তা তরফদার জানেন না। তাই তিনি রমেনবাবুর নানা রকম ইশারা ও বারণ অগ্রাহ করে অকপটে সব বলে যেতে লাগলেন। পরিতোষ চৌধুরি বিস্মিতভাবেই বললেন, এত সব ব্যাপার তো আমি জানি না। আমি শুধু শুনেছি। এটা ভূতুড়ে বাড়ি, এ বাড়িতে যে বাস করে সে-ই নির্বাংশ হয়। ভয়ে কেউ এ বাড়ি ভাড়া নেয় না। কিন্তু আপনার কাছে থেকে সব ঘটনা শুনে যেন আমার কেমন মনে হচ্ছে।

তরফদার বললেন, আমিও সেই রকম শুনেছিলাম। তবে আমারও মনে হয়। এ বাড়ির ভেতর কোনও রহস্য রয়েছে।

পরিতোষবাবু বললেন, আপনি কি সেই রহস্য উদঘাটন করতে পারবেন বলে মনে করেন?

তরফদার বললেন, হ্যাঁ, পারব বলে মনে হয়। তবে আপনাকেও এই ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে।

কী রকম সাহায্য করব বলুন?

এই বাড়ির বৃদ্ধ সৌদামিনীর সম্বন্ধে আপনার যদি কিছু জানা থাকে আমাকে খুলে বলতে হবে।

পরিতোষবাবু বলতে লাগলেন,--অনন্তলালের নাম নিশ্চয়ই আপনি আমাদের বাড়ির সরকার রমেন রায়ের মুখে শুনেছেন। সে ছিল সত্যি ভালো লোক। কিন্তু ওই সৌদামিনী জীবনে এমন ভুল করেছিল। যার জন্য সারা জীবন তাকে ভুগতে হয়েছিল।

সৌদামিনী যাকে বিয়ে করেছিল সে ছিল অনন্তলালের খুবই পরিচিত। লোকটির নাম বন্ধুবিহারী। এমন কোনও জঘন্য কাজ ছিল না। যা বন্ধুবিহারী না করতে পারত।

বন্ধুবিহারী যে খারাপ লোক তা অনন্তলাল জানত। কাজেই বিয়েতে তার মত ছিল না। কিন্তু সৌদামিনীর দিকে তাকিয়েই তাকে সম্মতি দিতে হয়েছিল।

বন্ধুবিহারী যতই ভালো মানুষ সেজে থাকুক না কেন কিছুদিনের মধ্যেই তার স্বরূপ প্রকাশ হতে লাগল।

প্রথম থেকেই বাড়িটার উপর তার লোভ ছিল। সে বুঝতে পেরেছিল অনন্তলালকে না। সরাতে পারলে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাই অনন্তলালকে সে-ই খুন করে। বন্ধুবিহারীর এক সাকরেদ ছিল তার এই অপকর্মের সহায়। তার সাহায্যেই বন্ধু এই গুরুতর কাণ্ড করতে সাহস পায়।

হাওড়ায় পুলের নীচে অনন্তলালের মৃতদেহ যখন পাওয়া গেল তারপর পুলিশ বন্ধুবিহারীর খোঁজ করে। বন্ধুবিহারীর গোপন আড়ায় হানা দিয়ে তার সাকরেদকে গ্রেফতার করে। বন্ধুবিহারী পালিয়ে যায়। এরপর থেকেই সে আত্মগোপন করে থাকে।

কিন্তু আত্মগোপন করে থাকলেও তার গোপন কার্যকলাপ বন্ধ হয় না। অনন্তলালের ছেলেকে সে-ই হত্যা করে। প্রথমে সৌদামিনী দোতলাতেই বাস করত। অনন্তলালের ছেলেটিও থাকত তার সঙ্গে। রাত্রিবেলায় মাঝে মাঝে বন্ধু সেই বাড়িতে আসত। সৌদামিনীকে বলত সে যেন কোনও কথা প্রকাশ না করে। ছেলেটিকে মেরে ফেলবার জন্য নানারকম পরামর্শ দিত।

সৌদামিনী তাতে রাজি হয়নি। অনন্তলালের ছেলেকে সে নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসত। তখন বন্ধুই একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় ছেলেটিকে দোতলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ছেলেটি মারা যায়। সৌদামিনী বন্ধুর কথামতেই পাড়ার লোককে বলে, ছেলেটি দোতলা থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে।

সৌদামিনী বুঝতে পেরেছিল তার জীবন সুখের হবে না। সে তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তখন কিছু করার আর উপায় ছিল না। বন্ধুর

কবল থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছা থাকলেও সে তখন হয়ে পড়েছিল অসহায়। বন্ধু ছাড়া তার আপনজনও আর কেউ ছিল না।

কিন্তু বন্ধুর জীবনও ছিল অভিশপ্ত। ইচ্ছা থাকলেও স্বাধীনভাবে সে চলাফেরা করতে পারত না। প্রায় আত্মগোপন করেই তাকে থাকতে হত।

যখনই লুকিয়ে মাঝে মাঝে সে এই বাড়িতে আসত তখনই সৌদামিনী তাকে ভৎসনা করত। কাজেই তার জীবনে ও শান্তি ছিল না।

বন্ধুবিহারী চেয়েছিল সৌদামিনীর উপর প্রভাব বিস্তার করে বাড়িটা তার কাছ থেকে নিজের নামে লিখিয়ে নিতে। অনেক রকম ফন্দিফিকির সে করেছিল। ভেবেছিল সেই ফন্দি সফল হলে সে আত্মপ্রকাশ করবে।

কিন্তু সৌদামিনী রাজি হয়নি। তখুন বন্ধুবিহারী সৌদামিনীকে হত্যা করবার ভয় দেখায়। সৌদামিনী তখন পাল্টা ভয় দেখাতে থাকে যে তার আগেই সে সব ঘটনা পুলিশের কাছে প্রকাশ করে দেবে।

কাজেই বন্ধুবিহারী খুবই মুশকিলে পড়ে যায়। তবু বন্ধুবিহারী তার স্বভাবগত হিংসাবৃত্তি চরিতার্থকরতে ছাড়েনি। সে বহুদিন সৌদামিনীকে মারধর করেছে। খুন করবার চেষ্টাও করেছে।

সৌদামিনী নিজের শক্তির জোরে বেঁচে গেছে মৃত্যুর হাত থেকে। অবশেষে বন্ধুবিহারী বোধহয় স্থির করে এই বাড়ির আশা ত্যাগ করে সে অন্য প্রদেশে চলে যাবে। একদিন সে সৌদামিনীর সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া করে। তারপরেও সে মাঝে মাঝে এই বাড়িতে আসত। চুপচাপ থাকত- সৌদামিনীর সঙ্গে কথা বলত না। মাঝে মাঝে গভীর রাতে কয়েকজন লোক নিয়ে বাড়িতে আসত। সৌদামিনীর ঘরে ঢুকত না। তারা কী করত। সৌদামিনী জানে না। রাত শেষ হবার আগেই সবাই চলে যেত।

যেদিন বন্ধু শেষবারের মতো এই বাড়িতে আসে, সেদিন যাবার সময় বলে যায়, এই বাড়িতে আমি আর কোনওদিন আসব না। কিন্তু এ কথা জেনে রেখো। এই বাড়িতে তুমিও সুখে বাস করতে পারবে না।

এরপর বন্ধুবিহারী সত্যি আর এই বাড়িতে আসেনি। দিনের পর দিন যেতে লাগল। অনুতপ্ত জীবন নিয়ে দিন কাটাতে লাগল সৌদামিনী। উপরের ঘর ভাড়া দিয়ে নীচে বাস করতে লাগল সে। আর্থিক অনটন তার হয়তো কোনওদিনই হত না, যদি না তার সঞ্চিত অর্থ যে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ছিল সেই ব্যাঙ্ক ফেল করত।

বাংলার বাইরে অন্য এক প্রদেশে ডাকাতি করতে গিয়ে বন্ধুবিহারী মারা পড়েছিল। সে খবর কী ভাবে যেন জানতে পেরেছিল সৌদামিনী। তারপরেই সে এই বাড়িটা বিক্রি করবার চেষ্টা করে। ঘটনাচক্রে আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। কান্নাকাটি করে আমার কাছে অনেক কথাই সে বলেছিল। তবে অনুরোধ করেছিল, আমি যেন কাউকে এই কথা না বলি। আমি তার অনুরোধ রক্ষা করেছিলাম। অসহায় বিধবার মুখের দিকে তাকিয়েই তাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলাম। তার ইচ্ছানুসারেই স্বীকার করেছিলাম। যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন এই বাড়িতেই বাস করবে।

সৌদামিনী মারা গেছে, তাই এখন আর কোনও কথা প্রকাশ করতে বাধা নেই। বাড়ির আমার দরকার ছিল না। শুধু বিধবাকে সাহায্য করবার জন্যই বাড়িটা কিনেছিলাম। কিন্তু এই বাড়িটা যে এত অভিশপ্ত তা কে জানত? আপনার কাছে সব কথা শুনে আমার তো মশাই আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাচ্ছে।

তরফদার বললেন, আমারও আক্কেল গুড়ুম হবার জোগাড়! কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে আমার কৌতূহল আছে বলেই আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। চিন্তা করছি, যে কোনও উপায়ে এর রহস্য উদঘাটন করা যায় কি না।

পরিতোষ চৌধুরি বললেন, যদি রহস্যের উদঘাটন করতে পারেন। তবে আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকব।

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, পরিতোষবাবু, বন্ধুর সেই গোপন আড্ডাটি কোথায় ছিল তা বলতে পারেন?

পরিতোষবাবু বললেন, না, আমি তা জানি না। ও সম্বন্ধে জানবার কৌতূহলও আমার কোনওদিন হয়নি।

তরফদার আবার জিজ্ঞেস করলেন, বন্ধুবিহারীর সেই সাগরেদটির খবর কিছু রাখেন কি? সে কি বেঁচে আছে, না এখনও জেলে আছে অথবা নিজের ব্যবসাই শুরু করেছে আবার?

ব্যবসা ছিল নাকি? আপনি কি তার খবর রাখতেন? আমি তো তার ব্যবসা সম্বন্ধে কিছু বলিনি আপনাকে।

তরফদার বললেন, সে আবার কি বলতে হয়? ছিনতাই, রাহাজানি এ সবই তো ছিল তাদের জাত-ব্যবসায়।

এবার হো হো করে হেসে উঠলেন পরিতোষবাবু। বললেন, ও, আমি আপনার কথার রহস্য বুঝতে পারিনি।

পরিতোষ চৌধুরি সেদিনই চলে গেলেন। তরফদার ভাবতে লাগলেন আকাশ-পাতাল।। কিন্তু সবার আগে, তার দুশ্চিন্তা হতে লাগল নিবারণের ব্যাপার নিয়ে। নিবারণ কোথায় গেল? তার বাড়িতেও সে ফেরেনি। তা হলে তার অন্তর্ধানের পেছনেও কি কোনও রহস্য আছে?

কে জানে?

নিবারণের অন্তর্ধান রহস্য

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। নিবারণ সেই যে ছুটে চলে গেছে আর সে আসেনি। কোথায় গেল সে? তরফদার নানা জায়গায় তার খোঁজ করলেন। কোথাও খোঁজ না পেয়ে চলে গেলেন থানায়। থানার ও সি চঞ্চল লাহিড়ী তরফদারকে চিনতেন। তিনি বললেন, কী ব্যাপার? আমাদের এখানে কী মনে করে? কোনও খুনের ঘটনা ঘটেছে নাকি?"

তরফদার বললেন, খুনের ঘটনা না ঘটলেও ব্যাপারটা খুব রহস্যজনক। আমার ভৃত্য ও সহকারী নিবারণ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন তরফদার। চঞ্চল লাহিড়ী বললেন, ভয় পেয়ে সে তার দেশের বাড়িতে চলে যায়নি তো?

তরফদার বললেন, যে ভুতকে এত ভয় পায় সে কি গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারবো?

চঞ্চল লাহিড়ী বললেন, কথাটা মন্দ বলেননি। কিন্তু যাবেই বা কোথায়? রাস্তায় খুনটুন হয়নি তো?

তরফদার বললেন, খুনটুন হলে তো আপনাদের এখানেই রিপোর্ট আসত।

চঞ্চল লাহিড়ী বললেন, আমার এরিয়া হলে এই থানার খবর আসত, কিন্তু অন্য এরিয়ায় এই ঘটনা ঘটলে তা তো আর এখানে আসবে না।

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কী মনে হয়?

চঞ্চল লাহিড়ী জবাব দিলেন, কলকাতায় কত রকম বিচিত্র ঘটনা ঘটে, কাজেই আগাম কিছু বলা অসম্ভব। তবে আমি একটা ডায়েরি লিখে রাখছি।

তরফদার থানা থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়িতে গেলেন। বিকেলের দিকে তৈরি হয়ে আবার এসে উপস্থিত হলেন সেই ভূতুড়ে বাড়িতে। কিন্তু মনটা তার ভয়ানক নিঃসঙ্গ। বাঘা নেই, নিবারণও নেই। একজন সঙ্গী থাকলে কাজে খুব সাহস বাড়ত।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে তরফদার বাড়ির ভিতরে পা দিলেন। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। বাড়ির ভিতরটায় কী রকম যেন একটা গুমোট ভাব।

নীচের তলার সামনের ঘরে পা দিয়েই থমকে গেলেন তরফদার। এ কী? মেঝের উপর কে পড়ে আছে অমন ভাবে?

কাছে গিয়ে দেখলেন, নিবারণ। একটা গোঙানির শব্দ তার মুখ থেকে বেরুচ্ছে। একেবারে জ্ঞানহারা সে হয়নি। জ্ঞান কিছুটা তখনও আছে।

বিস্মিত হয়ে গেলেন তরফদার। বাড়ির ভেতরেই একটা জলের কল ছিল। সেখান থেকে রুমালটা ভিজিয়ে এনে নিবারণের মুখে চোখে ঘষতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে প্রকৃতিস্থ হল।

স্থির হয়ে মেঝের উপরে উঠে বসিল নিবারণ। তারপর তার মুখ থেকে যে ঘটনা শোনা গেল তা খুবই আশ্চর্যজনক।

নিবারণ ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এমন ভয় পেয়েছিল যে কিছুতেই সে নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। পথে বেরিয়েও স্থির করতে পারছিল

না কোথায় যাবে। তারপর কীসের যেন আকর্ষণে সে ছুটে গিয়েছিল পথের বাঁক ঘুরে ছোট্ট বিলটার পাশে।

তরফদার এবার তাকে একটু থামতে বলে জিজ্ঞেস করলেন, কেন, তুমি বাড়িতে চলে যেতে পারলে না?

নিবারণ জবাব দিল, আমার যে একটা থাকবার আস্তানা আছে সে কথাও ভুলে গিয়েছিলাম কর্তা।

তোমার কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই। বিপদ হলে দুজনেরই হবে।

নিবারণ বলল, আমার কোনও কিছুই খেয়াল ছিল না কর্তা। আমার কী যে হয়েছে তা নিজেই জানি না। হয়তো কোনও মায়াবী ভর করেছিল।

তরফদার বললেন, বাজে কথা রাখো। তারপর কী হয়েছিল বলো।

নিবারণ বলল, সত্যি আমি যেন নেশার ঘোরে ছুটে চলেছিলাম। কোনদিকে যাচ্ছিলাম নিজেই বুঝতে পারছিলাম না। চলতে চলতে দেখলাম একটা ঝিলের পাশে এসে পড়েছি।

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কী হল?

নিবারণ জবাব দিল, তারপর কী হল আমি কিছুই জানি না কর্তা। আমার মাথাটা ঘুরছিল। তারপর বোধহয় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।

তরফদার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তুমি এখানে আবার এলে কী করে?

নিবারণ বলল, আজ দুপুরবেলায় আমার জ্ঞান ফিরে এল। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। ভাবলাম, আপনি এই বাড়িতে একা রয়েছেন। তাই আপনার খোঁজে এই বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

তারপর?

বাড়িতে ঢুকবার মুখেই আমি শুনতে পেলাম বাঘা যেন ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে।

বাঘা ডাকছে? এ কী কথা তুমি বলছ নিবারণ?

হ্যাঁ কর্তা। আমি নিজের কানে শুনেছি।

কিন্তু বাঘা যে মারা গেছে তা তো তুমি জানো? তাঁর মৃতদেহটা এখনও পড়ে আছে ঘরের মেঝেতে।

হ্যাঁ, তা তো জানি। কিন্তু—

চলো নিজের চোখেই তার মৃতদেহটা দেখে আসি। ওটাকে তো ঘর থেকে সরানোও দরকার। নইলে পচে দুর্গন্ধ বের হবে।

চলুন কর্তা।

নিবারণকে নিয়ে তরফদার দোতলার ঘরে গেলেন যেখানে কাল রাত্রে অনেক ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেছে। কিন্তু আশ্চর্যান্বিত হয়ে দেখলেন সেখানে বাঘার মৃতদেহ নেই।

চাপ চাপ রক্তের দাগ রয়েছে মেঝেতে, কিন্তু মনে হয় সেই রক্তের দাগ যেন আগের চেয়ে অস্পষ্ট-কিছুটা ম্লান। তা হলে অন্য কোনও জন্তু কি সেই রক্ত চেটে খেয়েছে?

সব কিছুই যেন রহস্যজনক মনে হতে লাগল তরফদারের কাছে। কী ব্যাপার?

নিবারণ জিজ্ঞেস করল, কর্তা, কেউ কি তা হলে এ বাড়িতে এসেছিল আমাদের চলে যাওয়ার পর? মরা কুকুরটাকে কি কেউ টেনে নিয়ে বাইরে ফেলে দিল, না ওটা আবার বেঁচে উঠল? আমি ঘেউ ঘেউ শব্দই বা শুনলাম কীসের?

তরফদার বললেন, ওসব কথা এখন থাক নিবারণ। এখন এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে। তোমার কাছে ব্যাপারটা শুনি।

দুজনে ঘরে বসলেন। নিবারণ বাসল খাটটার ওপর আর তরফদার বসলেন চেয়ারে। তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, কাল এ বাড়িতে পা দিয়েই তুমি কুকুরের ডাক শুনতে পেয়েছিলে, সেটা কি বাঘার ডাক না অন্য কোনও কুকুরের ডাক?

নিবারণ বলল, না কর্তা, ওটা ঠিক বাঘার ডাক। আমি কি বাঘার ডাক আর অন্য কুকুরের ডাক বুঝতে পারি না?

তখন তোমার কী মনে হল?

তখন আমার মনে হল—বাঘা কি তাহলে বেঁচে উঠেছে? বাঘা কি মরেনি?

বেশ তারপর?

ঘেউঘেউ শব্দটা কোনদিক থেকে আসছে তা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি কর্তা। একবার মনে হয়। ওপরে—একবার মনে হয় নীচের ঘরে। ওপরের ঘরের দিকে যাবার জন্য সিঁড়ির অর্ধেক পথে উঠতেই আবার বাঘার ঘেউ ঘেউ শব্দ নীচের দিকে শুনতে পেলাম। তখন নীচের ঘরে এসে ঢুকলাম। কিন্তু দেখি ঘর ফাঁকা। তখন বেরিয়ে আসবার জন্য পা বাড়লাম। কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারি না। হঠাৎ একটা আবছা ছায়ামূর্তি আমার পথ

রোধ করে দাঁড়াল। কিছুতেই আমাকে বের হতে দিল না। সাহস করে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু এক প্রবল ধাক্কায় মেঝের ওপর পড়ে গেলাম।

তরফদার এবার সত্যি মনের মধ্যে একটা প্রবল ধাক্কা খেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কী হল?

নিবারণ বলল, তারপর কী হল, আমি কী করে বলব কর্তা। আপনিই তো আমাকে চোখে মুখে জল দিয়ে সুস্থ করে তুললেন। আমার বড়ো ভয় লাগছে কর্তা।

তরফদার একটু থেমে বললেন, --আর কোনও ভয় নেই নিবারণ। আজ রাতটা এখানে কাটাব ভেবেছিলাম, কিন্তু আর কাটাব না। আজ ফিরে চলো। বাড়িওয়ালার সরকারের সঙ্গে আমার সব কথাবার্তা হয়ে গেছে। রবিবার দিন আমরা আবার এখানে এসে মিলিত হব। এবার আর এক নয়-সঙ্গে থাকবে কয়েকজন লোক আর কুলি-মজুর। ভূতের আড়া এবার ভাঙতে পারব আশা করি। তোমাকে ফিরে পেয়ে আমার প্রাণটাও যেন ফিরে এসেছে। চলো বাড়ি যাই।

সদরটা এবার বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন তরফদার। তারপর দুজনে ফিরে চললেন।

রহস্যের অনুসন্ধান

যথানির্দিষ্ট দিনে ও যথাসময়ে আবার তরফদারের হানাবাড়িতে আবির্ভাব ঘটল। গিয়ে দেখলেন, মিস্ত্রি ও মজুরদের নিয়ে রমেনবাবু তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

সেই ছোটো ঘরটাতেই আগে ঢোকা হল। ঘরে সিঁদুর মাখা কয়েকটা পাথর ও কতগুলি ভাঙা জিনিসপত্র দেখে তরফদার বললেন,-এই জিনিসগুলি আগে সরানো দরকার।

মজুরদের সাহায্যে সেই সব পাথর ও ভাঙা জিনিসপত্রগুলো সরিয়ে ফেলা হল। দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে গেল, মেঝের ওপর চৌকো দরজার মতো কী একটা জিনিস বসানো রয়েছে। সেটা লোহার শিকল ও তালা দিয়ে বন্ধ।

তরফদার বললেন, এটা কী? মনে হয় কোনও চোরাদরজা।

তরফদার বললেন, ভেঙে ফ্যালো দরজার শিকল ও তালা।

হাতুড়ি ও শাবল প্রভৃতির সাহায্যে তালা ও শিকল ভেঙে ফেলা হল। দরজা খুলতেই ভিতর থেকে বেরিয়ে এল স্ট্যাতসেঁতে বন্ধ বাতাসের দুর্গন্ধ।

রমেনবাবু উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলেন। তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, রমেনবাবু, কী দেখছেন ভিতরে?

রমেনবাবু বললেন, মশাই, এটা তো একটা চোরাকুঠুরি বলে মনে হচ্ছে, ভেতরটা যে একেবারে অন্ধকার।

এর মধ্যে সাপ আছে কি ব্যাং আছে বোঝবার উপায় নেই। তাই বললেন, আলো না নিয়ে নীচে নামা কিছুতেই নিরাপদ নয়।

রমেনবাবু বললেন, হাঁ, ঠিক তাই।

লণ্ঠন জ্বালিয়ে আনার ব্যবস্থা হল। তরফদার বললেন, আসুন রমেনবাবু আমার পেছনে।

রমেনবাবু শিউরে উঠে বললেন, এবার আমার পৈতৃক প্রাণটা যাবে দেখছি।

তরফদার একটুখানি ঢুকেই বললেন, পাশের ওই দেয়ালটাও ভাঙতে হবে, নইলে ঢোকা যাবে না।

মজুরদের দিয়ে দেয়ালটারও কিছু অংশ ভাঙতে হল। তখন ভিতরে যাবার পথটি যেন আরও প্রশস্ত হল। তখন তরফদার রমেনবাবুকে বললেন, এবার এগিয়ে আসুন।

তরফদার নিজেও এগিয়ে যেতে লাগলেন। রমেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আমাকেও সত্যি ওখানে ঢুকতে হবে নাকি?

তরফদার জবাব দিলেন, ঢুকতে হবে না তো কী? দেখছেন না। আমি ঢুকছি।

রমেনবাবু বললেন, আমার ঢুকে কী লাভ বলুন?

তরফদার বললেন, লোকসান হবে বলেই বা ভাবছেন কেন? লাভও তো হতে পারে।

রমেনবাবু বললেন, কিন্তুতরফদার বললেন, কিন্তু নয়, আসুন, লাভ লোকসান যা হবে দুজনেই না হয় ভাগ করে নেব।

রমেনবাবু সেই গন্তব্যস্থলের দিকে তাকিয়ে বললেন, ও মশায়, আপনি কি মনে করেন ওখানে গুপ্তধন আছে নাকি?

তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কী মনে হয় ?

রমেনবাবু জবাব দিলেন, আমার মনে হয়, গুপ্তধনের আশা যদি আপনি করে থাকেন তবে খুবই ভুল করছেন।

তরফদার বললেন, আপনার ভয় করছে নাকি? জানেন তো গোলাপ তুলতে গেলে কঁটার আঘাত পেতে হয়।

রমেনবাবু বললেন, তা জানি।

তরফদার বললেন, তবে আর দেরি করছেন কেন? দেখছেন তো আমি ঢুকছি।

রমেনবাবু আর আপত্তি করতে পারলেন না। তরফদারের পদাঙ্ক অনুসরণ তাকে করতে হল।

কোনওরকমে হামাগুড়ি দিয়ে দুজন সেই চোরাকুঠুরিতে ঢুকলেন। দুজন মজুরকেও সঙ্গে নেওয়া হল। অন্ধকার চোরাকুঠুরি। কোনও দিক থেকে আলো ঢুকবার ব্যবস্থা নেই। প্রথমে সবাই সেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। অন্ধকারে সবারই চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর অন্ধকারটা যেন চোখে একটু সয়ে এল। কিছু কিছু দেখা যেতে লাগল। ঘরের ভেতরটা। চোরাকুঠুরির ভেতরে আসবাবপত্র কিছুই নেই, আছে শুধু একটা লোহার সিন্দুক।

সিন্দুকটায় মরচে ধরে গেছে, কিন্তু অত্যন্ত মজবুত। চাবি বন্ধ করা। কিন্তু চাবি কোথায়! অনেক খুঁজেও চাবি পাওয়া গেল না। তখন মজুরদের সাহায্যেই অনেক চেষ্টা করে সিন্দুকটার ডালা খোলা হল।

সকলেরই কৌতূহল ছিল, ভিতরে অনেক কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু কোনও ধনদৌলত বা বহুমূল্য জিনিস পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল একখানি হাতে লেখা পুথি আর তার উপরে বসিয়ে রাখা একখানা চিনেমাটির রেকবি।

রমেনবাবু বললেন, ওটা কী?

সবার মনেই কৌতূহল আর আশঙ্কার ভাব। কিন্তু কেউ ওটাকে ধরবার সাহস পেল না।

বললেন, আমার টর্চটা ধরুন।

রমেনবাবু টার্চটা হাতে নিলে সাহস সঞ্চয় করে আস্তে আস্তে রেকগবিখানা হাতে করে তুলে নিলেন তরফদার।

সবার তখন কৌতূহল সেদিকে। তরফদার রমেনবাবুকে বললেন, টর্চের আলোটা ভালো করে এটার উপর ফেলুন তো।

রমেনবাবু টর্চের আলো নিবদ্ধ করলেন সেই রেকবিটার উপরে। দেখা গেল তাতে জলের মতো টলমল করছে কী একটা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও তরল পদার্থ। তারই ভিতরে বসানো আছে কম্পাস বা দিকদর্শন যন্ত্রের মতো দেখতে একটি ছোটো যন্ত্র। একটি কীটাও রয়েছে। যন্ত্রের মধ্যে এবং সেটা অতি দ্রুত গতিতে ঘোরাফেরা করছে এদিকে আর ওদিকে।

সবাই একটু অবাক হয়ে গেল, সেই জিনিসটি দেখে। কারুর মুখে কোনও কথা নেই, নির্বক দর্শকের মতো সবাই সেই আশ্চর্য জিনিসটি দেখতে লাগল।

সবাই ক্রমে ক্রমে অনুভব করল, সেই জলের মতো পদার্থ থেকে চারদিকে যেন একটা অদ্ভুত গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। গন্ধটা তীব্র নয়, খারাপ কিছু বলেও মনে হল না।

কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যেন কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলেন তরফদার। তীর দেহ, মন ও শিরা উপশিরার মধ্যে সেই অজানা গন্ধ আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করল। তার শরীরে যেন একটা মৃদু কম্পন অনুভব করতে লাগলেন। তারপর শুধু তরফদারের উপরে নয়, অন্যান্য সকলের উপরেও সেই প্রভাব পড়তে বিলম্ব হল না। তারাও যেন দেহে মৃদু কম্পন অনুভব করতে লাগলেন।

ক্রমেই যেন বাড়তে লাগল সেই প্রতিক্রিয়া।

তরফদারের হাতের আঙুল থেকে মাথার চুলে পর্যন্ত এমন অসহনীয় বিদ্যুৎ প্রবাহ চলাচল করতে লাগল যে, তিনি যেন কী রকম একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কী রকম যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি! রেকাবিখানা আর ধরে রাখতে পারলেন না তরফদার। সেটা মাটির উপরে পড়ে সশব্দে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। তরল পদার্থটা মেঝের উপরে গড়তে লাগল এবং যন্ত্রটাও ছিটকে পড়ল একদিকে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে লাগল এক অলৌকিক ব্যাপার।

ঘরের চারদিকের দেওয়াল কাঁপতে কাঁপতে দুলতে লাগল—মনে হল যেন কোনও বিপুলবপু মহাদানব প্রচণ্ড আক্রোশে ঘরের সব মানুষের উপর ধাক্কার পর ধাক্কা মারছে। প্রথমে কেউ কিছু বুঝতে পারল না। সবাই নির্বক, নিস্তব্ধ। কিন্তু তারপরেই সকলের মুখে ভাষা ফুটে উঠল। ‘পালান! পালান!’ রব উঠল কুঠুরির মধ্যে।

সবাই সন্ত্রস্ত। সবাই চঞ্চল। সকলেই বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ল। কিন্তু হতবুদ্ধি হয়ে তারা যেন বাইরে বেরুবার পথও হারিয়ে ফেলেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভীষণ আতঙ্ক নিয়ে সকলে কোনওরকমে চোরাকুঠুরির বাইরে পালিয়ে এল।

কিন্তু ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে পালাবার সময়ও তরফদার পুঁথিখানা আনতে ভুললেন না। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলেন-সেটা কোনও ছাপানো বই নয়-হাতে লেখা 'মহানির্বাণতন্ত্র'।

বাইরে আসার পর কোনও কম্পন আর কেউ অনুভব করতে পারল না। তরফদার একটু নিশ্চিন্তভাবেই পুঁথিখানা খুলে দেখতে লাগলেন। ভিতরে পাওয়া গেল একখণ্ড কাগজ। তার উপরে কতগুলি কথা লেখা। অনেকদিন আগেকার লেখা বলেই মনে হয়। বিবর্ণ হয়ে গেছে লেখাগুলি।

তরফদার লেখাগুলির বক্তব্য উদ্ধার করবার চেষ্টা করলেন। সকলেই সেই কাগজখণ্ডটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর তরফদার কথাগুলির মর্ম উদ্ধার করতে সমর্থ হলেন। কাগজটিতে এই কথাগুলি লেখা—

এই বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে সচেতন বা অচেতন জীবন্ত বা মৃত যা কিছু আছে, যন্ত্রের কাঁটা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে তারাও চলবে আমার ইচ্ছাশক্তির বশবর্তী হয়ে। অভিশপ্ত হোক এই বাড়ি—অশান্তিপূর্ণ হোক এখানকার প্রত্যেক আত্মা।

সুমন্ত তরফদার ভাবতে লাগলেন এগুলি দিয়ে কী করবেন। রমেনবাবু এতক্ষণ প্রায় হতভম্ব নীরব দর্শকই ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী ভাবছেন তরফদারবাবু?

তরফদার জবাব দিলেন, এগুলি নিয়ে কী করব তাই ভাবছি।

রমেনবাবু বললেন, এসব শত্রুকে নষ্ট করে ফেলুন, পুড়িয়ে দিন।

—হ্যাঁ, তাই করব।

—করব নয়, এখনই করুন।

—বেশ তাই হোক।

পুঁথি, কাগজপত্র ও যন্ত্র সব বাইরে এনে জড়ো করা হল। জড়ো করা হল কিছু শুকনো কাঠ ও নানা জিনিসপত্র। তারপর তরফদার মজুরদের বললেন, এগুলোতে আগুন ধরিয়ে দাও।

আগুনে সব কিছু পুড়িয়ে দেওয়া হল।

তরফদার বললেন, এ বাড়ি নিয়ে আমার গবেষণা শেষ। আজ থেকে আমার ছুটি।

রমেনবাবু বললেন, আপনি কি মনে করেন, ভূতের উপদ্রব আর এ বাড়িতে হবে না?

তরফদার বললেন, হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়।

রমেনবাবু বললেন, কিন্তু—

তরফদার বললেন, যদি এর পরও কোনও কিছু উপদ্রবের কথা শোনেন, তবে আমাকে খবর দেবেন। আমি আবার নতুনভাবে গবেষণা করব।

বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তরফদার। তাঁর কথাই সত্য হয়েছিল। এরপর ওই বাড়িতে আর কোনও উপদ্রবের কথা শোনা যায়নি।